জুন ২০১৮ ❑ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৪২৫

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

ঈদ সংখ্যা

১০ টি গল্প

১ টি উপন্যাস

কমিক্স

হালুমের সাক্ষাৎকার

এবং আরো মজার কিছু ...

কমিকস্

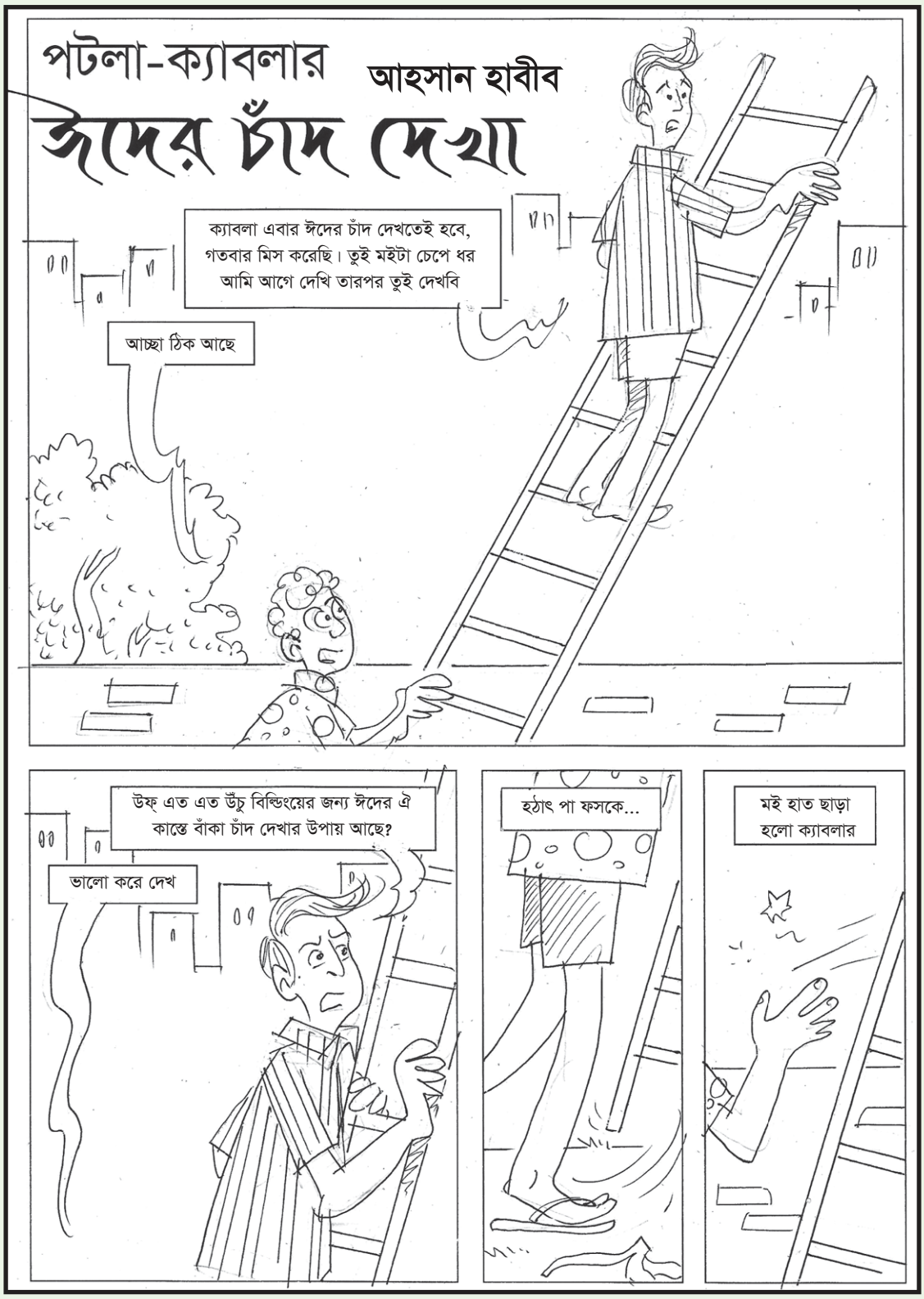
পটলা-ক্যাবলার
আহসান হাবীব
ঈদের চাঁদ দেখা
ক্যাবলা এবার ঈদের চাঁদ দেখতেই হবে, গতবার মিস করেছি। তুই মইটা চেপে ধর আমি আগে দেখি তারপর তুই দেখবি
আচ্ছা ঠিক আছে
উফ্ এত এত উঁচু বিল্ডিংয়ের জন্য ঈদের ঐ কাস্তে বাঁকা চাঁদ দেখার উপায় আছে?
ভালো করে দেখ
হঠাৎ পা ফসকে...
মই হাত ছাড়া হলো ক্যাবলার

শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগ

উদ্যোগ ১০

পরিবেশ সুরক্ষা

শেখ হাসিনার নির্দেশ
জলবায়ু সহিষ্ণু বাংলাদেশ

ছোট্ট বন্ধুরা, তোমরা কি জানো, শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগের একটি হচ্ছে 'পরিবেশ সুরক্ষা'। অনেকে হয়ত জানো 'শেখ হাসিনার নির্দেশ/জলবায়ু সহিষ্ণু বাংলাদেশ' স্লোগান নিয়ে এ উদ্যোগ এগিয়ে চলছে। দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জনগোষ্ঠীর বসবাস উপযোগী পরিবেশ নিশ্চিতকরণকল্পে মোট বনভূমির পরিমাণ সম্প্রসারণ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলা, গবেষণা, উদ্ভিদ জরিপ এবং বনজ সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে টেকসই পরিবেশ ও বন নিশ্চিতকরণ এ কর্মসূচির প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

একটি উন্নয়নশীল দেশের জন্য এ উদ্যোগ ছিল অপেক্ষিত। এর ফলে বাংলাদেশে এখন বনভূমির বিস্তার ঘটেছে। সর্বত্র পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার শুরু হয়েছে। নির্মল বায়ু প্রকল্প, বর্জ্য শোধনাগার স্থাপিত হয়েছে। পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে গৃহীত হয়েছে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধন) আইন-২০১০, পরিবেশ আদালত আইন-২০১০, জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন-২০১০ এবং বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন-২০১২। ইতোমধ্যে এ সকল আইন ইতিবাচক ফল বয়ে এনেছে। এছাড়া আন্তর্জাতিক মহল থেকেও এসেছে স্বীকৃতি। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী উদ্যোগের জন্য জাতিসংঘের পলিসি লিডারশিপ শ্রেণিতে 'চ্যাম্পিয়ন অব দ্য আর্থ ২০১৫' পুরস্কারে ভূষিত হন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এ উদ্যোগের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় রয়েছে ২০২০ সাল নাগাদ বনভূমির হার ২০ শতাংশে উন্নীত করা। ঢাকাসহ অন্যান্য শহরে বায়ুর গুণগতমান বাড়ানো এবং বায়ুদূষণ কমিয়ে আনা। ১৫ শতাংশ জলাশয় শুষ্ক মৌসুমে অভয়ারণ্য হিসেবে গড়ে তোলা।

প্রতিবেদন : সুলতানা বেগম

Regd, Dha, 143-Monthly Nobarun, Vol-42, No- 12, June 2018, Tk-20.00

ও মন রমজানের ঐ

কাজী নজরুল ইসলাম

ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এল খুশির ঈদ
তুই আপনাকে আজ বিলিয়ে দে, শোন্ আসমানী তাগিদ ॥

তোর সোনাদানা, বালাখানা সব রাহে লিল্লাহ
দে যাকাত, মুর্দা মুসলিমের আজ ভাঙাইতে নিদ ॥

তুই পড়বি ঈদের নামাজ রে মন সেই সে ঈদগাহে
যে ময়দানে সব গাজী মুসলিম হয়েছে শহীদ ॥

আজ ভুলে গিয়ে দোস্ত-দুশমন, হাত মিলাও হাতে,
তোর প্রেম দিয়ে কর্ বিশ্ব নিখিল ইসলামে মুরিদ ॥

যারা জীবন ভরে রাখছে রোজা, নিত্য-উপবাসী
সেই গরিব এতিম মিস্কিনে দে যা কিছু মফিদ ॥

ঢাল্ হৃদয়ের তশ্তরীতে শিরনি তৌহিদের,
তোর দাওত্ কবুল করবেন হজরত, হয় মনে উমীদ ॥

তোরে মারল ছুড়ে জীবন জুড়ে ইট পাথর যারা
সেই পাথর দিয়ে তোল্ রে গ'ড়ে প্রেমেরি মসজিদ ॥

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
১১২ সার্কিট হাউজ রোড ঢাকা

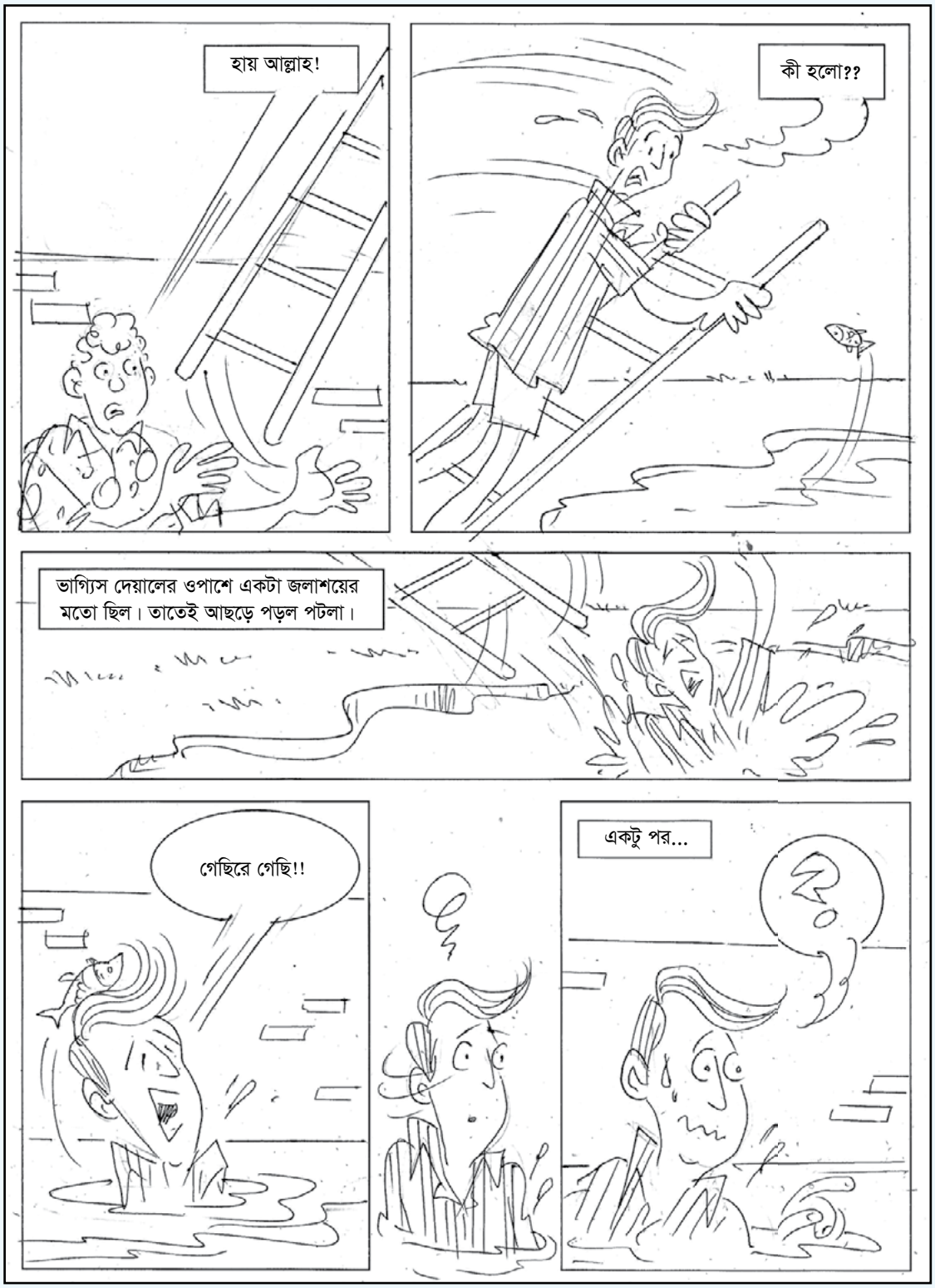
হায় আল্লাহ!
কী হলো??
ভাগ্যিস দেয়ালের ওপাশে একটা জলাশয়ের মতো ছিল। তাতেই আছড়ে পড়ল পটলা।
গেছিরে গেছি!!
একটু পর...

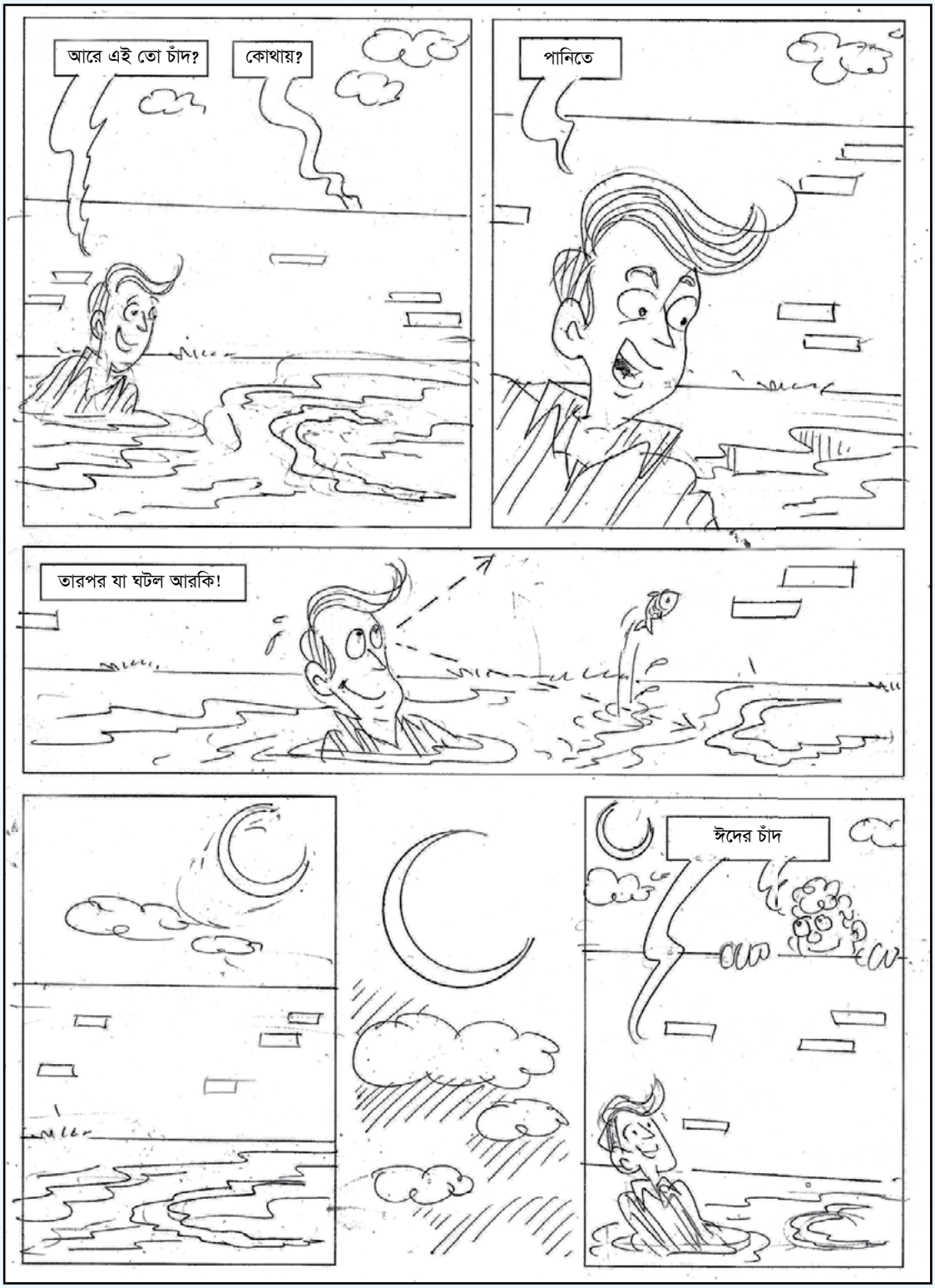
আরে এই তো চাঁদ?
কোথায়?
পানিতে
তারপর যা ঘটল আরকি!
ঈদের চাঁদ

সম্পাদকীয়

বন্ধুরা, খুব খুশি লাগছে তোমাদের হাতে নবারুণ ঈদসংখ্যা তুলে দিতে পেরে। গল্প-কবিতা-উপন্যাস-কমিকস্, কী নেই এতে! তুমি পড়বে, বন্ধুকে পড়তে দেবে। সবাই মিলে ভাগ করে নেবে ঈদসংখ্যার আনন্দ। ঈদের আনন্দ কত বেড়ে যাবে, বলো তো?

তবে মনে রাখতে চাই, আমাদের আনন্দ ঠিক রাখতে উদয়াস্ত পরিশ্রম করেন বাংলার কৃষকরা। তাই নবারুণ ঈদসংখ্যা উৎসর্গ করছি সে-সকল কৃষকদেরকে।

প্রধান সম্পাদক
মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন

সিনিয়র সম্পাদক
মোঃ এনামুল কবীর

সম্পাদক
নাসরীন জাহান লিপি

সহ-সম্পাদক
শাহানা আফরোজ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মন

সম্পাদকীয় সহযোগী
তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা
মেজবাউল হক
সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

মূল্য : ২০.০০ টাকা

সূচি

কমিকস্

০১ ঈদের চাঁদ দেখা/ আহসান হাবিব

ঈদ গল্প

০৯ এমনও হয় বুঝি/ ঝর্ণা দাশ পুরকায়স্থ
১৬ ভাইবোন/ সুজন বড়ুয়া
১৮ ঈদ এবং হিমু সমাচার/ রফিকুর রশীদ
২৬ খাজুর সন্ন্যাসী/ মুস্তাফা মাসুদ
৩০ ও ব্রজনাথ/ ফারুক নওয়াজ
৫৪ পুটু গেল মেলায়/ কাজী কেয়া
৫৮ এলিয়েন/ আফরোজা পারভীন
৬৩ শিকল হরিণ/ মোজাম্মেল হক নিয়োগী
৭৬ জিতে গেল ব্যাঙ ছানা/ কামাল হোসাইন
৮০ বাবার কষ্ট/ ফজলে আহমেদ

উপন্যাস

৩৫ সুজন ও কালামানিকেরা/ আহমেদ রিয়াজ

নিবন্ধ

২৩ সেকালের গল্প/ খন্দকার মাহমুদুল হাসান
৭১ মুক্তিযুদ্ধের দিনরাত্রি/ আবুল কালাম আজাদ
৮২ আমাদের স্থলের বৃহত্তম প্রাণী/ ড. আ ন ম আমিনুর রহমান
৮৫ চলো, ভালো রাখি পরিবেশ/ মোকারম হোসেন
৮৬ সোনালি ব্যাগ/ তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা
৮৭ অন্যের ঈদে যাদের আনন্দ/ মেজবাউল হক
৮৮ ঈদের খাবার-দাবার/ শাহানা আফরোজ
৮৯ ঈদে থাকো সুস্থ/ মো. জামাল উদ্দিন
৮৯ প্রতিবন্ধী শিশুর ঈদ আনন্দ/ জান্নাতে রোজী
৯১ ঘুরে এসো ঈদের ছুটিতে/ সাদিয়া ইফফাত আঁখি
৯২ রাশিয়া বিশ্বকাপ ফুটবল-২০১৮/ মিজানুর রহমান মিথুন
৯৭ প্রধানমন্ত্রীর ১০ উদ্যোগ/ সুলতানা বেগম

কবিতা

০৮ তামিম আল হাদী/ তাসিন হোসেন
মো. রাশেদুল ইসলাম সাগর
২২ মো. রায়ান কামাল/ রেবেকা ইসলাম
৩৪ সরদার আবুল হাসান/ সানজানা শরীফ
৫৭ ব্রত রায়/ মিহির মুসাকি
৬২ পৃথ্বীশ চক্রবর্ত্তী/ শামীম খান যুবরাজ
৭০ মোহাম্মদ আজহারুল হক/ সোহেল বীর
৭৪ লুৎফর রহমান রিটন
৭৮ জাকির হোসেন কামাল
৭৯ হামিদা খানম

স্মৃতিকথা

২৭ ঈদ ও কচ্ছপের গল্প/ ড. হারুন রশীদ

সাক্ষাৎকার

৫২ হালুম! নবারুণে হালুম!

ছোটোদের লেখা

৭৫ আমার মুক্তিযুদ্ধের গল্প/ সামারা রশীদ

আঁকা ছবি

০৫ জান্নাতুল ফেরদৌস জিনিয়া,
৭৫ জুনায়েদ তৌহিদ
৯৪ তাসনিয়া আফ্‌ফান মুনতাহা
৯৫ মুমতাইনা রাহমান, সাহী আদভী ইসলাম
৯৬ তমা বিশ্বাস, তৌসিফ আলম তুহিন

শিল্প নির্দেশক
সঞ্জীব কুমার সরকার

সহযোগী শিল্প নির্দেশক
সুবর্ণা শীল

অলংকরণ
নাহ্‌রীন সুলতানা

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৩১১৪২, ৯৩৩১১৮৫
E-mail : editornobarun@dfp.gov.bd
ওয়েবসাইট: www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৫৭৪৯০

মুদ্রণ : মিতু প্রিন্টিং প্রেস এন্ড প্যাকেজিং
১০/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

নবারুণ ঈদসংখ্যা

ঈদ শব্দটির অর্থ উৎসব, উৎসব মানেই অনেক অনেক আনন্দ। ঈদের খুশিতে নবারুণের বন্ধুদের জানাই ঈদ মোবারক। শুধু মোবারকবাদ দিলেই তোমাদের মন ভরবে না। তাই তো নবারুণ নিয়ে এসেছে ঈদসংখ্যা। এ সংখ্যায় তোমাদের জন্য রয়েছে মজার মজার ১০টি গল্প আর বাংলাদেশের কৃষকদের ঈদ আনন্দ উৎসর্গ করা ১টি উপন্যাস। সাথে রয়েছে ঈদের চাঁদ খোঁজার মজার কমিকস্। সিসিমপুরের হালুম ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে দিয়েছে সাক্ষাৎকার। সেই সাথে আরো আছে পরিবেশ নিয়ে নিবন্ধ, ঈদের কবিতা, বিশ্বকাপের খবর, আরো কত কি! ঝটপট সংগ্রহ করো আর ঈদের আনন্দের ভাগীদার করে নাও নবারুণ ঈদসংখ্যাকে।

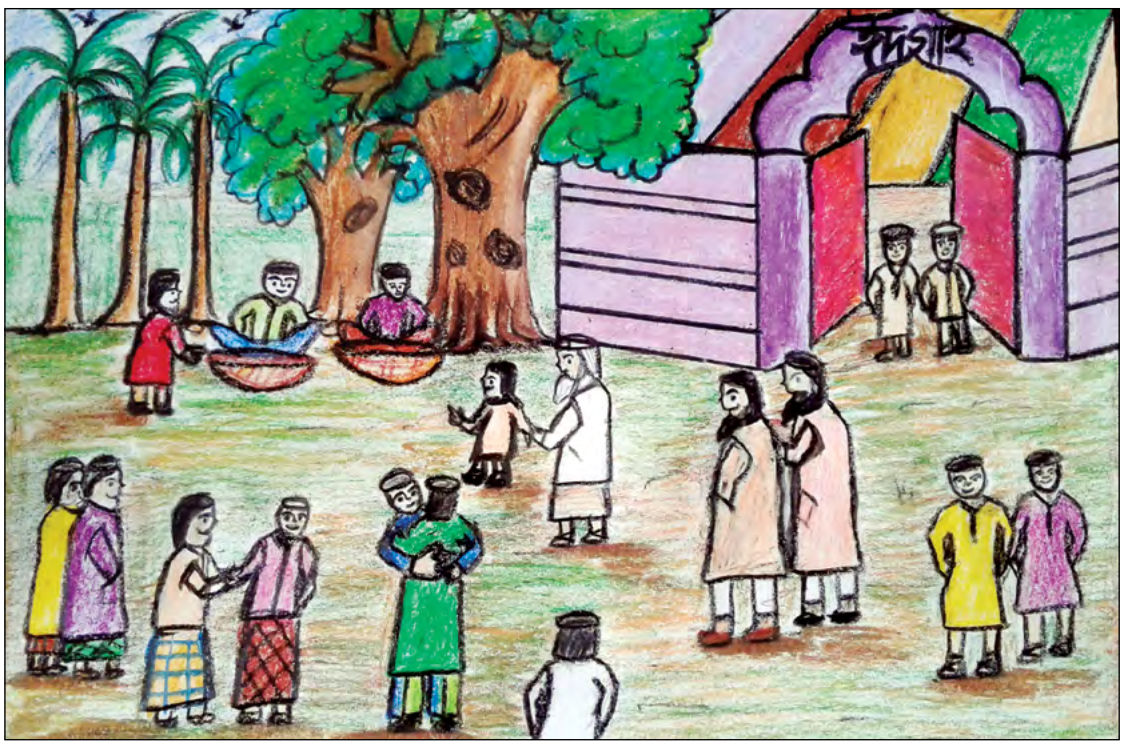

জান্নাতুল ফেরদৌস জিনিয়া, দশম শ্রেণি, গংগাচড়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, গংগাচড়া, রংপুর।

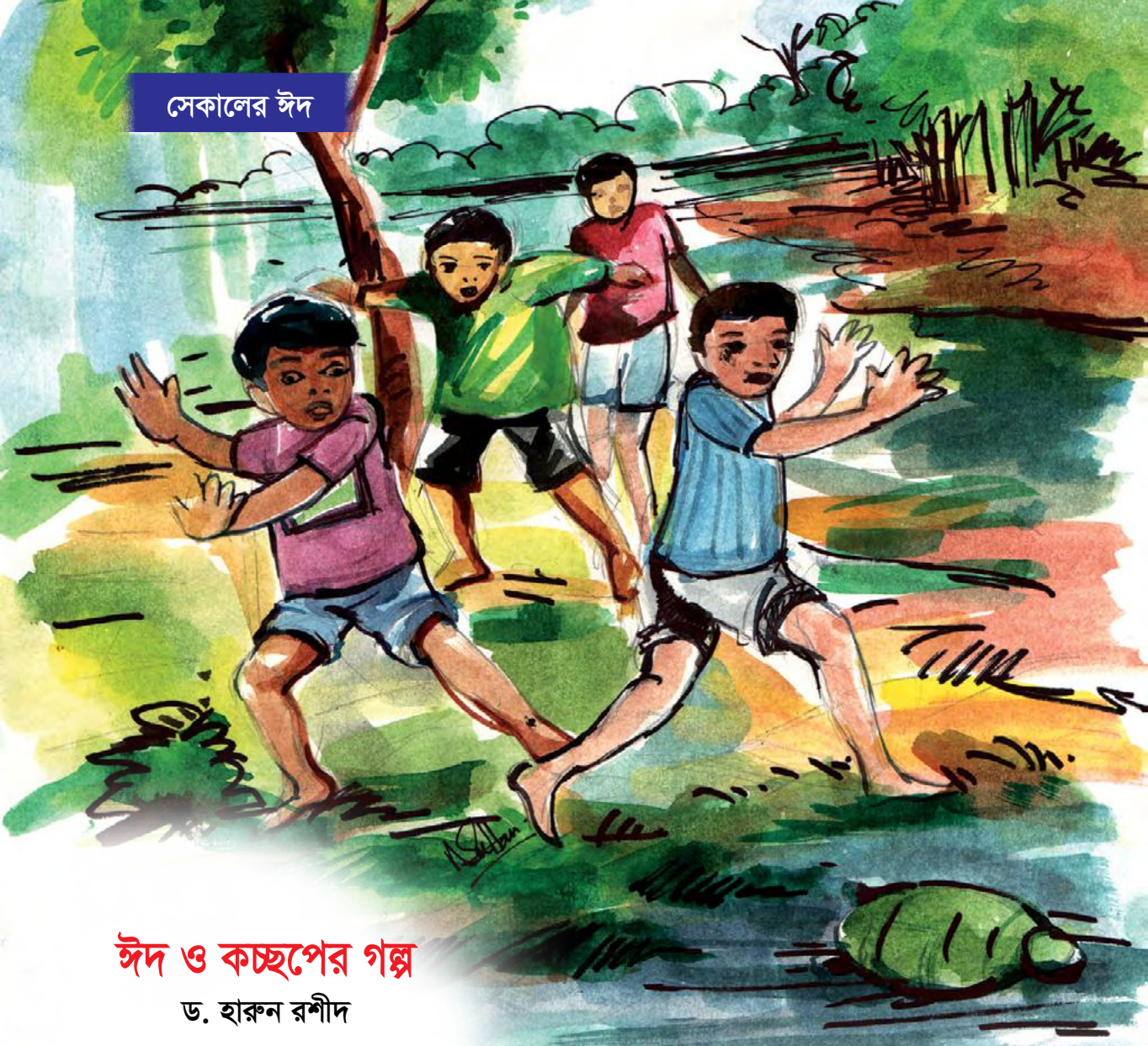

ঈদ ও কচ্ছপের গল্প

ড. হারুন রশীদ

কথায় কথায় আমরা ঈদের দিনের মতো আনন্দের কথা বলি। ঈদ যে কতটা আনন্দ ও উৎসবের বারতা নিয়ে আসে সেটি সেকালের ঈদের কথা না জানলে বোঝা যাবে না। বিশেষ করে গ্রামের ঈদগুলো ছিল খুবই উৎসবমুখর। পারিবারিক-সামাজিক মেলবন্ধনও হতো প্রতি ঈদে। থাকত নানা আনন্দ আয়োজন। খেলাধুলা হতো। মেলাও বসত।

ঈদের সকালটা শুরু হতো শেমাই পায়েস খেয়ে। তার আগে সকাল সকাল উঠে গোসল করা। এখনকার বন্ধুরা বিশ্বাস করবে কিনা জানি না। অনেক পরিবার আছে বছরে এই একটা দিন সাবান দিয়ে গোসল করত। বলছি দরিদ্র, মধ্যবিত্ত পরিবারের কথা। গায়ে মাখার এই সাবানকে বলা হতো বাসনা সাবান। এক ধরনের সুগন্ধ বের হতো সাবান থেকে। তাই এই সাবানের নাম বাসনা সাবান। অর্থাৎ সুগন্ধি সাবান। কাপড় কাচা সাবান দিয়েও অনেকে গোসল করত। কাপড় কাচা সাবান হিসেবে ৫৭০ সাবান ছিল বহুল প্রচলিত।

গোসল করে নতুন জামা-জুতো পরে ঈদগাহে যেতাম একসঙ্গে। আর নতুন জামার ইতিহাসটা একটু বলে নিই। আমাদের গ্রামের বাজারে সপ্তাহে একদিন হাট বসতো। ঈদের নতুন জামা কেনার জন্য আমরা বায়না ধরতাম

আগে থেকেই। অনেক সপ্তাহ ঘুরে তবে মিলতো কাঙ্ক্ষিত জামা, জুতো। তখন কিন্তু এত বাহারি জামাকাপড় ছিল না। রেডিমেড জামা ছিল কম। দর্জির কাছে অর্ডার দিয়ে জামা বানাতে হতো। আমাদের পাশের বাড়িতেই ছিল দর্জির দোকান। দর্জিকে আমরা খলিফা বলতাম। তো গজ কাপড় কিনে শার্ট বা জামা বানানোর জন্য খলিফার কাছে দেওয়া হতো। তিনি মাপজোক নিয়ে খাতায় লিখে রাখতেন। তারপর সময় সুযোগ বুঝে বানিয়ে দিতেন।

দর্জি হিসেবে খুব একটা পারদর্শী ছিলেন না পাশের বাড়ির সেই খলিফা। দেখা যেত সেলাই আঁকাবাঁকা হয়ে গেছে। বাম পাশের পকেট লাগিয়ে রেখেছেন ডান পাশে। একহাতা ছোটো আরেক হাতা বড়ো বানিয়ে রেখেছেন। যেহেতু দর্জির দোকানের সংখ্যা ছিল কম আর ঈদের সময় প্রচণ্ড ভিড় লেগে থাকত তাই যেভাবেই বানিয়ে দিন না কেন তাতেই যেন মহার্ঘ হাতে পেতাম।

রাতে বালিশের নিচে নতুন জামা রেখে ঘুমাতাম। আর একটু পর পর বের করে দেখতাম। কখন সকাল হবে আর কখন এই জামা পরতে পারব। তর সইতো না। নতুন জামা বালিশের নিচে রাখার আরো একটা কারণ ছিল। তখন ইস্ত্রি দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। তাই বালিশের নিচে রাখার কারণ হচ্ছে যাতে বালিশের চাপে ভাঁজ পড়ে জামাটা মসৃণ ও সুন্দর হয়।

সেমাই পায়েসের পাশাপাশি চাল আর খেজুরের গুড় দিয়ে এক ধরনের মিষ্টান্ন রান্না করা হতো। লাল টকটকে সেই মিষ্টান্নকে আমরা বলতাম নাস্তা। মায়ের হাতের সেই নাস্তা না খেলে ঈদের আনন্দই যেন মাটি। নাস্তার ওপরে মোটা সর পড়ত। দেখতেও অনেক সুন্দর হতো। সুগন্ধও বের হতো সে খাবার থেকে। এখনো চোখ বন্ধ করলে নাস্তার ঘ্রাণ পাই। খুব মিস করি সেই নাস্তাকে।

দেওয়ান বাড়ির ঈদগাহ মাঠে আমরা ঈদের নামাজ পড়তে যেতাম। আমাদের স্কুলের মওলানা স্যার ঈদের জামাত পড়াতেন। কালো মোটা কাপড়ের একটা কিস্তি টুপি পরে মওলানা স্যার খুব সকাল সকাল সবার আগে ঈদগাহে উপস্থিত হতেন। নামাজ শুরুর আগে উপস্থিত লোকজনের উদ্দেশ্যে স্যার ভালো ভালো কথা বলতেন। ঈদের আনন্দ সবাই যেন একসাথে ভাগাভাগি করে নেওয়া যায় এ ধরনের কথা বলতেন। তাছাড়া গরিবদুঃখী মানুষকে দান করার কথাও বলতেন মওলানা স্যার। স্যারের একটি উপদেশমূলক গল্পের কথা এখনো মনে আছে।

ঈদে নতুন জুতো না পেয়ে একজন খুব রাগ করেছে। ঘুম থেকে ওঠে না। গোসল করে না। নাস্তা খায় না। পরিবারে এ নিয়ে সবার খুব মন খারাপ। আসলে সামর্থ্য না থাকায় জুতো কিনে দিতে পারেনি তার পিতা। রাগ করে ছেলেটি রাস্তার ধারে গিয়ে বসে রইল। তখন দেখতে পেল লাঠিতে ভর করে তারই সমবয়সি একটি ছেলে ঈদের নামাজ পড়তে যাচ্ছে পরিবারের সদস্যদের সাথে। ছেলেটির একটি পা নেই। তখন জুতো না কেনা ছেলেটির বোধোদয় হলো। আরে আমি নতুন জুতোর জন্য মন খারাপ করছি। আর ওর তো পা নেই। ও তো জুতোই পরতে পারবে না। আর আমার তো পা আছে। আমি তো হেঁটে যেতে পারব। ছেলেটির মন ভালো হয়ে গেল। সে অভিমান ভুলে ঈদের আনন্দে মেতে উঠল।

স্যার যখন এই গল্পটি বলত তখন সবাই চুপ করে শুনত। আর আমি চিন্তা করতাম সত্যি তো আমরা কত সামান্যের জন্য দুঃখ করি। অথচ কতজনের কত কিছু নেই। তারপরও তারা সুখী।

তখন বেশ ছোটো ছিলাম। তাই ঈদগাহের মাঠের পাশে পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম। ঈদের জামাতে যখন সবাই একসাথে নামাজে দাঁড়াতো, সিজদায় যেত আমার ছোটো মনে সেটি ছিল এক আনন্দের বিষয়। দেখতে খুব সুন্দর লাগত। একবার হলো কি হঠাৎ করে হইচই। দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়ে গেল। ছোটোদের চিৎকার-চেঁচামেচি থামাতে বড়োরাও দৌড়ে ছুটে এলেন। দেওয়ান বাড়ির পুকুরটি ছিল অনেক দিনের পুরোনো। সেখানে ইয়া বড়ো এক কচ্ছপ ছিল। সেই কচ্ছপটি পুকুরের পানিতে ভেসে উঠতেই শিশুরা ভয় পেয়ে যায়। আর তাতেই চেঁচামেচি আর দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়ে যায়। সত্যি বলতে কি আমিও খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। এরপর থেকে ঈদগাহে যাওয়ার সময় সতর্ক থাকতাম। কচ্ছপের কথা মনে হলেই গায়ে কাটা দিয়ে উঠত।

কচ্ছপের আয়ু নাকি তিনশ বছর। তো যাই হোক, বদ্ধ পুকুরের মধ্যে বাস করা কচ্ছপ যত বড়ো আর বয়স্কই হোক না কেন ডাঙায় দাঁড়িয়ে থাকা লোকজনের জন্য তা ভয়ের কোনো কারণই না। এভাবে কত তুচ্ছ জিনিসকেও যে এক সময় ভয় পেতাম। সেটি মনে হলে এখনো হাসি পায়।

ঈদের দিনে

তামিম আল হাদী

ঈদের দিনে সবাই মিলে
অনেক মজা করবো,
নতুন জামা পরবো।
সেমাই পায়েস খাবো
ঈদগাহে যাবো।

দ্বিতীয় শ্রেণি, রামেশ্বরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নাটোর

ঈদের খুশি

তাসিন হোসেন

নতুন জামা, নতুন জুতা
নতুন ঈদের কাপড়
ঈদের দিন কাটে মোদের
নানা খুশির ভেতর।

কেউ বা বড়ো কেউ বা ছোটো
যাই যে সবই ভুলি
নামাজ শেষে সবার সাথে
করি কোলাকুলি।

ষষ্ঠ শ্রেণি, মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা।

ঈদ মোবারক

মো. রাশেদুল ইসলাম সাগর

আজকের এই খুশির দিনে
ঈদের দাওয়াত দিলাম
তোমরা সবাই চলে এসো
বড়োদেরকে দাও ছালাম।
নতুন জামা ও খাবার দেব
গরিব-দুঃখীর মাঝে
ঈদ আনন্দ ছড়িয়ে যাবে
শহর-পাড়া-গ্রামে।
কোলাকুলি করবো মোরা
ঈদের নামাজ শেষে
খুশি মনে ফিরব বাড়ি
চলব হেসে হেসে।

এসএসসি পরিক্ষার্থী, জুরাইন, ঢাকা।

এমনও হয় বুঝি

ঝর্ণা দাশ পুরকায়স্থ

চেয়ারে বসলে মনটা বড়ো উচাটন করতে থাকে। নাহ্ বলাটা ঠিক হলো না। সামনের টেবিলে যখন হোমওয়ার্কের খাতা থাকে, বিশেষ করে অঙ্ক আর ইংরেজি বই থাকে তখন বিদঘুটে ভাবনাগুলো মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। কী করা যায়? কী করা যায়? অঙ্ক কষতে একেবারেই ইচ্ছে করে না, ইংরেজি গ্রামার সে তো আরো বিচ্ছিরি।

এমন সময়টাতে ইমতির যাচ্ছে তাই কিছু একটা করতে ইচ্ছে করে। কেন এমন হয় কে জানে।

ঝাঁ ঝাঁ বৈশেখের দুপুর হলে তো কথাই নেই। রোদ পুড়ে যাওয়া ছাদটি যেন আয় আয় বলে ইশারায় ডাকতে থাকে। সেখানে যে তেলে ডুবানো তেঁতুল-আম-কুলের আচার কাচের বোয়ামে চুপটি করে বসে থাকে। কুলগুলো তেল মশলা আর মিষ্টিতে মাখামাখি হয়ে টসটসে মার্বেলের সাইজ হয়ে যায়। তেল-ঝাল আর মিষ্টি উফ্ ভাবতেই ইমতির মুখের ভেতর পানিতে ভরে যায়।

ইভা খুব মনোযোগ দিয়ে মেশিন দিয়ে সেলাই করছেন। খুব আস্তে করে দরজার ছিটকিনি খুলে ঘরের সামনে এসে দাঁড়ায় ইমতি। ছাদে ওঠা এক পলকের ব্যাপার।

ঢাউস তিন চারটে কাচের বোয়ামে ধবধবে সাদা কাপড় দিয়ে মুখ আটকে রেখেছে দাদিমা। চটপট বোয়ামের মুখের কাপড় সরিয়ে টেস্ট করতে থাকে ইমতি। মাথা থেকে অঙ্ক আর ইংরেজির ভয় বেমালুম উধাও হয়ে যায়। আচারগুলো ঠিক ওষুধের মতো কাজ করে।

আম্মু যখন ভুনা মুগির সাথে আচার খেতে দেয় তখন তো এমন ভালো লাগে না, আসলে চুরি করে খাওয়ার মাঝে মজার কোনো ব্যাপার রয়েছে।

সাবান দিয়ে হাত কচলে ধুতে গেলে দাদি জিজ্ঞেস করেন, কি রে হলো কি তোর? চুরি করে কিছু খেয়েছিস না কি?

মোটেও নয়, কথাটা দিব্যি বলে দিলে দাদিমা। অঙ্ক দিয়ে এমনই মাথা গরম হয়ে আছে।

দাদিমা উদাস সুরে বলেন, তাহলেই ভালো।

নিরাপদেই কাটে সময়টুকু। বিকেলের দিকে বুয়া ছাদ থেকে বোয়ামগুলো নিয়ে এসে আহাজারি শুরু করে। কেডায় খাইল আম্মা? তেলে তুলে ফালায়া, ঢাককন টারে আচারের তেল দিয়া কে চপচইপা করল গো।

দাদি গম্ভীর মুখে বলেন, বুঝলে বউমা, দুপুরবেলা ইমতি সাবান দিয়ে হাত ঘষেছিল তো, তখনই বুঝতে পেরেছি নাতি একখান কাণ্ড ঘটিয়েছে।

ইমতি বলে, মোটেও নয় দাদি। তুমি কি দেখেছ আমাকে আচার খেতে। দ্যাখোনি তো।

ইভা বলে, ইমতি খুব খারাপ অভ্যেস এটি, না বলে কয়ে খাওয়া। কখনও এমন হয়েছে তুমি কিছু চেয়েছ আর আমি দিইনি। বুয়া বলে, দ্যাখেন আম্মা, ডাইনিং টেবিলের এই খানটা তেল দিয়া পিছলা কইরা থুইছে, দ্যাখেন আম্মা বরইর বীচি, এই দ্যাখেন আমলির বীচিও রইছে।

রুদ্র চাচ্চু কলেজ থেকে ফিরল সেই সময়। বুয়ার কথা শুনে বলে ওমা এ তো আমাদের হুসনা। বুয়া নয়, এ হলো বেকার স্ট্রিট থেকে আসা শার্লক হোমস। কি গো ধরতে পেরেছ চোর?

লাজুক হেসে বুয়া বলে, কী যে কয় ভাইয়া।

দাদি আম্মু আর চাচ্চুর হাসিতে ব্যাপারটি ধামাচাপা পড়ে যায়। ব্যাপারটি নিয়ে আর কেউ ঘাটাঘাটি করে না। তবে হুসনা বুয়া মেঝে আর বেসিনের তেল সাবান দিয়ে পরিষ্কার করতে করতে বলে, মরার তেল যাইবার চায় না।

দাদিমা ধমক দিয়ে বলেন, এবার চুপ করতো বাপু।

রুদ্র চাচ্চু হাসিমুখে বলল, আজাইরা প্যাঁচাল কইরো না তো বুয়া। হাতে ভিজে ন্যাতা উড়ু উড়ু মাথার চুল নিয়ে বুয়া চ্যাঁচায়, আমি আজাইরা প্যাঁচাল পারি?

ব্যাপারটি যে সহজেই মিটমাট হয়ে গেছে বুয়ার এটি পছন্দ নয়। ইভা বলে, তুমি ঠিকই বলেছ হুসনাবু, কিন্তু ছেলে কথা শুনলে তো, চাইলেই পায় তবু চাইবে না, চুরি করবে।

এটা চুরি? ভেতরে ভেতরে ফুঁসে ওঠে ইমতি। অঙ্ক করতে ভালো লাগছে না, একগাদা হোমওয়ার্কে মাথা ঝিমঝিম করছে, এ সময়টাতে এক খাবলা আচার নিয়ে জিভে- টাকরায় আওয়াজ করে খাওয়া যায় তখন বেশ লাগে। টেনশনটা বেমালুম দূরে চলে যায়। কথাটি বড়োরা বুঝতে চায় না কেন?

নারকেলের নাড়ু, ক্ষীরের সন্দেশ খেলেও কিছুটা রিলিভ পাওয়া যায়, তবে টক, ঝাল, মিষ্টি আচার হলো মহা ঔষধ। রুদ্র চাচ্চু ইমতির ফেভারে গিয়ে বলেন, আচার হলো চুরি করে খাওয়ার জিনিস। আচার চুরির জন্য কারো জেল ফাঁসি হয়েছে শুনেছ।

ইমতি মনে মনে স্যালুট জানায় রুদ্র চাচ্চুকে। ইশকুল থেকে রোজ ফিরে ওর আম্মুর কাছে সব বলা চাই-ই চাই। একদিন বলল, আমাদের ক্লাসের অনেকেই বিদেশের কত কিছু গল্প করে, আমি তো বিদেশ যাইনি আমি চুপ চুপ বসে থাকি। ইভা বলেন, কেন তোর ছোটো মামু কানাডা থাকে না? আমরাও বিদেশে হঠাৎ করে চলে যাব। দেখিস।

সব কিছু ম্যাজিকের মতো ঘটে গেল। পৃথিবীর নাম্বার ওয়ান জাদুকর যেন তার ম্যাজিক স্টিক ছুঁইয়ে দিয়ে বলল, গো এহেড, সামনের দিকে চলে যাও। হ্যাঁ আম্মু-আব্বুর সাথে কানাডাতে যাচ্ছে ইমতি। মেঘের স্রোত দিয়ে সূর্যের আলো মেখে বিমানটি ছুটে যাচ্ছে কী অদ্ভুত লাগছে ওর। আগে কোনোদিনও সে প্লেনে চড়েনি। ভীষণ থ্রিলিং ব্যাপার তো অবশ্যই। দারুণ খুশি ও, তারপরও একটু একটু অভিমানও জমা হয়ে আছে ছোট্ট বুকের ভেতরে। দেড় মাসের ভিসা পাওয়া গেছে। ইভা গুনগুন গান করতে করতে গোছানো শুরু করেছেন। অফিসের কাজ নিয়ে কবীর খুব ব্যস্ত। এর মাঝে আব্বুর গলা জড়িয়ে ধরে ইমতি এক রাতে বলে খাবার আগে দুদিনের জন্য সুনামগঞ্জ যাওয়া যায় না আব্বু? বলো না আব্বু। যাবে না কেন? নিশ্চয়ই আমরা সুনামগঞ্জ যাব, বিকজ ইউ লাভ দিস প্লেস- তাই না ইমতি? তুমি ভালোবাসো শহরটিকে। আদরে গলে যেতে যেতে ছলোছলো সুরে ছেলে বলে, আমি শহরটিকে দারুণ ভালোবাসি আব্বু। একেবারেই অন্যরকম একটি জায়গা। কবীর খুশিমাখা গলায় বলেন, তাইতো যাব আমরা, তবে কানাডা ঘুরে এসে ঠিক আছে।

ওকে আব্বু।

বাবা ছেলের কথা ইভার কানে গেছে। বিরক্ত হয়ে বলে, ঠিক আছে ইমতি তুমি এই শহরটিকে ভালোবাসো। কিন্তু বদলি হয়ে গেলে সেই শহরে কি মানুষ আবার ফিরে যেতে পারে। এর আগে আমরা কিশোরগঞ্জ ছিলাম, পাবনাতেও থেকেছি দু'বছর। আবার যেতে পেরেছি বলো। গোমড়া মুখে ইমতি বলে, তখন ছোটো ছিলাম আমি, ভালো করে দেখিনি, বুঝিওনি। এবার আমি অনেক বড়ো হয়েছি। সুনামগঞ্জ শহর ঘুরে ঘুরে দেখেছি, ইশকুলে আমার বন্ধু ছিল অনেক। পিন্টো, অঙ্কুর, কল্প, রাতুল, বৃষ্টি, সানী আমার কত বন্ধু ছিল মা। ফুটবল, ক্রিকেট খেলেছি- ওদের জন্য মন আমার কাঁদবে না মা। তুমিই বলো।

ইমতিয়াজ ইমতির মন ভীষণ নরম আর কোমল। ও আকাশের মেঘ দেখতে ভালোবাসে, বৃষ্টি ঝরলে অপলক তাকিয়ে থাকে, পাখি আর ফুল সে বিভোর হয়ে দেখে। মাঝে মাঝে শুধু চুরি করে আচার খায়। আম্মু বলে, ঠিক আছে ইমতি, কানাডা থেকে ঘুরে এসে তারপর না হয় দু'চার দিনের জন্য যাব। ঠিক আছে।

প্রমিস করো আম্মু।

কবীর বলেন, প্রমিজ করো ইভা। ছোটোদের কখনও মিথ্যে প্রলোভন দিতে নেই। কানাডা থেকে ফিরে অফকোর্স যাব। কানাডার এডমনটন সিটিতে যাচ্ছি আমরা বুঝলে ইমতি। সব মনে পড়ছে ইমতির।

অক্টোবর মাস শরৎকাল এখন, বাংলায় আশ্বিন। ইমতি প্লেনে বসে দেখে চমৎকার এক ঝকঝকে সকাল। বরফের মতো সাদা মেঘ ভেঙে বিমানটি আকাশ পথ বেয়ে চলছে। অপলক চেয়ে থাকে ইমতি, কখনো দেখে ঝকঝকে সূর্য, কখনও মেঘের গুচ্ছ কখনো রুপালি ফিতের মতো নদী, দেশলাই বাক্সের মতো এইটুকুন ঘর বাড়ি।

কাতার এয়ার ওয়েজ ল্যান্ড করার পর কী আনন্দ। মামু মামির সাথে এসেছে ওদের ছেলেমেয়ে টম আর মম, টম ইমতির চেয়ে ছোটো মম আরো ছোটো ঠিক পুতুলের মতো।

নতুন দেশ, ঠান্ডা আবহাওয়া। হবেই তো, সময়টা শরতের শেষ। বাড়ির সামনের আপেল গাছটি দেখে দারুণ লেগেছে ইমতির। টুপটাপ করে ঝরে পড়ে, ও মুখে দিয়ে দেখেছে বেশ টক। লাল রং করা সাইকেল যাবার রাস্তাগুলো চমৎকার। ওর বয়েসি ছেলে মেয়েরা সাইকেল চালিয়ে স্কুলে যাচ্ছে। ওদেরকে দেখতে দেখতে ইমতি ভাবে, ওরা কি ছাদে রোদে দেয়া আচার চুরি করে খায়। মনে মনে লজ্জা পায় ও। ওদের মায়েরা তো তেল মশলা দেয়া টক, ঝাল, মিষ্টি আচার করতে জানেই না। পেট ব্যথা বলে ওরা কি স্কুল কামাই করে ? গড নোজ- ইমতি জানে না। পাইন আর ওক গাছের দিকে তাকিয়ে মনে হয়, সত্যি দেশটা সুন্দর। ঝকঝকে তকতকে । চিৎকার চেঁচামেচি নেই, গাড়ির হর্নও বাজে না। নতুন দেশ দেখার অন্যরকম এক মজা রয়েছে। কেমন করে যে শীত বিকেলের মতো একমাস ফুরিয়ে গেল ইমতি বুঝতে পারেনি। এবার দেশে ফেরার পালা। এডমনটন থেকে ফিরে এসে জেটল্যাগ আর কাটে না কারোর। এমন হবেই তো, কানাডায় যখন রাত আমাদের বাংলাদেশে তখন দিন। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। দুইদিন কানাডায় বৃষ্টি দুই চোখ ভরে দেখেছে। সব জায়গার বৃষ্টি একই রকম। সেই সন্ধ্যায়। ক্যাফেতে বসে আব্বু আম্মু ফেনা ভরা ক্যপাচিনোতে চুমুক দিচ্ছিল। ইমতির হাতে বাতাবি লেবুর জুস। কী যে ঝেপে বৃষ্টি নেমেছিল অক্টোবরের সন্ধ্যায়। সবাই ছুটছে রঙিন ছাতা হাতে নিয়ে। বেশ লেগেছিল ওর। কবীরের ছুটি আরো দশ বারো দিন রয়েছে। বিদেশে গিয়েও ইমতির ঘোরা ফেরার সাধ মিটেনি। হ্যাঁ ছেলের কাছে তিনি প্রমিজ করেছেন, ইমতির প্রিয় শহরে তাকে একবার তিন চার দিনের জন্য যেতে হবে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও বলেছেন, শিশুদের সাথে মন ভোলানো কথা বলতে নেই। কবি ভাবেন, বাচ্চাদের আমরা কত ভাবেই না ভুলিয়ে রাখি। তুমি ভালোভাবে পড়ো তো সোনা, বিকেলে তোমাকে সন্দেশ খেতে দেব। শিশুটি খেলাধুলায় মেতে থেকে বেমালুম ভুলে গেল সন্দেশ খাবার কথা। বড়োদের কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না। তিনি শিশুটির কাছে প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ। শিশুটি ভুলে গেলেও মা-বাবাকে সন্দেশ খাইয়ে দিয়ে বলতে হবে সকালবেলা তোমার কাছে প্রমিজ করেছিলাম যে। দশ বছরের ইমতির প্রিয় শহরে তাকে যেতেই হবে। ছেলে না হলে একদিন বলবে, আব্বু কথা দিয়ে কথা রাখেনি। আবার শুরু হলো গোছগাছ। তিন চারদিনের জন্য যাওয়া, দুটো ট্রলি ব্যাগ গুছিয়ে নেয় ইভা। উঠবেন ইমতির বেস্ট ফ্রেন্ড রাতুলের বাড়িতে। রুবি আন্টি আর অসীম আঙ্কেলের সাথে পারিবারিক সম্পর্ক। মোবাইলে জানিয়ে দিতেই রাতুলের বাবা-মা খুশিতে মেতে উঠেন। রাতুল বলে, তুই আসবি ইমতি? ইয়েস দোস্ত। কাতার এয়ার ওয়েজে ওঠার পর দারুণ ব্রেক ফাস্ট পেয়েছে, লাঞ্চ আওয়ারে কত কিছু খেয়েছে ইমতি, বাটার চিকেন, ডাল, মাখন তো মুখে লেগে আছে এখনও। এখন কিন্তু ঝকমারি কম নয়। ঢাকা থেকে পারাবত ট্রেনে করে সিলেট, সেখান থেকে বিরতিহীন মাইক্রোবাসে করে তবেই না প্রাণের শহর সুনামগঞ্জ। বুকের ভেতরটা আনন্দে ভরপুর। কই, কানাডার এডমনটন সিটিতে যেতে এর দশভাগের একভাগও আনন্দ হয়নি তো ওর।

হ্যাঁ, অনেক কিছু দেখেছে ইমতি, অনেক কিছু শিখেছে। কী চমৎকার বরফের দানা দানা ফুল ঝরা দেখেছে, মামাতো ভাইবোন টম আর মম-এর

সঙ্গে একজোট হয়ে স্নো ম্যান সেজেছে। আর ৩১ অক্টোবরের হ্যালোইন পার্টি। ভূতের জন্য পুরো একটি রাত বরাদ্দ রয়েছে, তাতো কানাডাতে না এলে সে জানতেই পারত না। এমিলি লরা, আইরিন, ববি, টম আর মম-এর সাথে দারুণ ফান করেছে ইমতি।

এখানে যেমন মাছের ভুনা, আলু দিয়ে মুরগির ঝোল খেয়েছে, সেখানে প্রায় রোজই খেয়েছে বেকড ফিস, মাটন রোস্ট, প্রচুর স্যালাড খেয়েছে ইমতি, যা বাড়িতে

ও খেতেই চায় না। মামি একটি জিনিস চমৎকার রাঁধতেন সেটি হলো স্টু। ব্রোকোলি বেবিকর্ন, টমেটো, ফুলকপি, গাজর আর কিছু চিকেনের কিউব দিয়ে রাঁধতেন। গরম স্টুতে কিছুটা মাখন দিয়ে রাখতেন। বাটার টোস্ট দিয়ে খেতে দারুণ লাগত ইমতির। ওদের জন্য প্রায়ই চকোলেট কেক, ফ্রুটস কেক বানাতেন মামি। মামাও কাজে সাহায্য করতেন। টম আর মম এর সাথে ইমতিও টেবিল সাজাতো। বেকিং-এর মনকড়া গন্ধে ভরে থাকত কিচেন ডাইনিংরুম। সবাই মিলে গরম স্যুপ খাওয়া শীতের দেশে ভারি মজার ব্যাপার। গুনগুন আওয়াজে হিটার গরম তাপ ছড়াতো, বড়োরা ডিনারের পর রেলিশ করে ব্ল্যাক কফিতে চুমুক দিতেন। গল্প যেন ফুরোতেই চাইত না। অন্যরকম এই জীবন দেখে কোথায় যেন হারিয়ে যেত ইমতি। ওক, স্পট পাইন আর আপেল গাছের পাতাগুলো শীতের হিমেল হাওয়ায় শিরশিরিয়ে উঠত। ফুলগুলোর কথা বলে কাউকে বোঝাতে পারবে না ও। ড্যাফোডিল, টিউলিপ, ব্ল্যাকরোজ, জিরানিয়াম অচেনা এই ফুলগুলোর দিকে তাকিয়ে সময় ওর হুঁশ করে ফুরিয়ে যেত।

স্কুলে গেলে ক্লাসমেটরা সিঙ্গাপুর, সিডনি নয়ত বার্লিন শহরের গল্প করত।

ইমতি বলত, আম্মু ক্লাসের বন্ধুরা বিদেশের গল্প করে। আমি চুপ করে বসে থাকি, জয়েন করতে পারি না।

ট্রেনে যেতে যেতে সে ভাবে বিদেশের গল্প আমি ঝুলি ভরে নিয়ে এসেছি। এবার আমি শুধু বলব, বলতেই থাকব আর তোরা শুনবি। শুধু হাঁ করে শুনবি। ভাবতে ভাবতে আত্মতৃপ্তিতে মন ওর ভরে যায়।

সুনামগঞ্জ বাসস্ট্যান্ডে যখন নামল ওরা তখন হেমন্তের সোনালি বিকেল। গরমের তাপ নেই, ঠান্ডা এক স্নিগ্ধ হাওয়ায় শরীর- মন জুড়িয়ে যায়।

রাতুল আর ওর বাবা নিতে এসেছেন ওদের। ইমতি চেনা শহরের চারপাশটা দেখে। বুকের ভেতর শিরশিরে এক আনন্দ। কানাডাতে প্রথম পা রাখার পর এমন তো মনে হয়নি। রিকশা করে হাসননগর যেতে যেতে দেখে, পুরনো বটগাছ, কৃষ্ণচূড়া আর নিমগাছের মিষ্টি ছায়া। আনন্দ মাখা যেন চারপাশ মনে মনে গুনগুন করে- আজ কী আনন্দ আকাশে-বাতাসে।

কবীর ইভাকে বলেন, যা করে শিশুরা আনন্দ পায় তাই করতে দেয়া উচিত ইভা। কানাডা গিয়েও এত হাসি মাখা মুখ দেখেছ?

এখন যেন খুশিতে উপচে পড়ছে ইমতি।

পেছনের রিকশায় বসা রাতুল আর ইমতি ওভারটেক করে গেল আব্বু-আম্মুকে।

ইমতির উচ্ছ্বসিত স্বর, তোমরা হেরে গেছ আম্মু আমরা আগেই বাসায় পৌঁছে যাব।

ইমতির মন শুধু গাইতে থাকে আজ কী আনন্দ আকাশে বাতাসে। চারটে দিন শুধু এই গানটি মনে মনে গাইবে ইমতি। কবীর হাসিমুখে বলেন, বিদেশে গিয়ে ওর আনন্দ পূর্ণ হয়নি এবার ওর চেনা শহরে এসে খুব খুশি। বি হ্যাপি মাই চাইল্ড।

কার্তিকের শেষ। কী চমৎকার হেমন্তকাল। রোদের ঝাঁঝ নেই, ভোরবেলা অল্প অল্প ঠান্ডা লাগে। এজন্য রাতুলের মা রুবি মামি নকশা করা চমৎকার কাঁথা দিয়েছেন।

তিন-চার দিন থাকবে ওরা। রাতুলের বাবা অসীম আঙ্কেল আর রুবি আন্টির ব্যস্ততার শেষ নেই। বাজার-হাট চলছে তো চলছেই। প্রতিটি বাড়ির পেছনে পুকুর রয়েছে। ঘরগুলো ঘিরে চৌকো উঠোন। কামরাঙা, নিম আর তমাল গাছের ছায়ায় স্নিগ্ধ কার্তিকের বিকেলটি আরো চমৎকার হয়ে উঠেছে।

উঠোনে বসে চা খেতে খেতে কবীর বলেন, ইমতি তো সুনামগঞ্জ শহরটির জন্য পাগল একবারে। সত্যি এখানে এলে মন ভরে যায়। বলতে ইচ্ছে করে এমন শহর কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি। ইভা বলে, ইমতির আব্বুর রিটায়ারমেন্টের পর আমরা এখানেই সেটল করব।

রুবি বলে, সে কি আর হবে ভাবী? আপনারা বিক্রমপুরের লোক, এতদূরে এসে কি আর থাকবেন এ হলো কথার কথা। অসীম বলেন, শুধু ইমতি নয়, ভাই ভাবিরও ভালো লেগেছে শহরটি। মাঝে মাঝে সময় করে বেড়াতে এলেই আমরা খুশি হব। রুবি বলে, যা তো রাতুল তোর আরজু খালাকে ডেকে নিয়ে আয়।

ইভা বলে, আরজু খালাটা কে গো ভাবী?

আমাকে বলতে হবে না, ও নিজে নিজেই ওর পরিচয় দেবে, রাতুল আর ইমতি বেরিয়ে গেছে। এখানে সবকিছুই চেনা, টুংটাং বেল বাজিয়ে রিকশা যাচ্ছে প্রাইভেট কারও যাচ্ছে, তবে যানজট নেই।

এই গো আমি আইয়া পড়ছি। আরজুরে মনে পড়ল কিয়ের লাইগা? বাইতে মেহমান আইছে নি?

মুখ ভর্তি পান, জর্দা-কীমামের গন্ধে বাতাস ভুরভুর করছে। এই তাহলে আরজু খালা।

পানের পিক ফেলে বলে, তোমরা আছিলা না এই শহরে? আমারে তো ডাকছইন না কুনুদিন?

রুবি বলে ভাবি তো মিক্সি দিয়ে মশলা বাটে। তোমারে ডাকত কিয়ের লাইগা? কথা কম, বেশি করে কাজ করো। পানের ডাব্বা মাটিতে রেখে আরজু বলে, ফালায়া থন মিসকি বিসকি। পাটা-পুতার মতো ভালা কিছু আছেনি। রাতুল ইমতি ফিরে এসে আরজুকে দেখছে। ইমতি বলে, মিসকি বিসকি না খালা, এর নাম মিকসি। ঐ হইল। কথাডা একই। আরজু দুই হাত দিয়া যে মসল্লা বাটব মিসকি বিসকি ধারও আইত না।

রুবি বলে, স্টপ আরজু স্টপ, আর কথা না, মশলা বাটতে বসো। কোমরে ছাপা শাড়ির আঁচল গুঁজে নেয় আরজু। রান্নাঘরের বারান্দায় শিল পাটা নিপুণ হাতে ধুয়ে নেয়। ছোটো ছোটো বাটিতে হলুদ, মরিচ, জিরে, ধনে, এ যেন আরজু-এর শিল্পকর্ম।

উঠোন বারান্দা ঘরে ঘরে লাইট জ্বলছে। হেমন্তের মন খারাপ করা সন্ধ্যে হেসে উঠেছে গল্প-হাসিতে আর কথায়। আরজু বলেই চলছে আমি তো বুজছি মেহমান আইছে নাইলে কি আর অভাগি আরজুর ডাক পড়ে? তবে কথা হইল রান্দন বাড়নের আগের কথা হইল মশল্লা, কথায় আছে, না মশলা হইল চন্দন। তবেই হইব রন্ধন। দ্যাখবেন শহইরা ভাবি আইজ ছালুনের ক্যামুন সোয়াদ হয়। পেলেট চাইটা খাইবেন। হাসির রোল পড়ে যায়। ইমতি যা দেখে তাই ভালো লাগে। রাতুলের বাড়িটাকে মনে হচ্ছে উৎসব বাড়ি।

ঘড়ঘড় করে মশলা বাটা হচ্ছে। রুবি আন্টি কড়াই ভর্তি গরম তেলে ছেড়েছে কই মাছ, নারকেল কিসমিস এলাচি দারুচিনি দিয়ে রেঁধেছে মুগডাল। মাছের ভুনা আর মুরগির কারি হয়েছে দারুণ। সত্যি আরজু খালার ঘড়ঘড় মশলায় জাদু আছে। বাড়িতে ভাত তরকারি নিয়ে যাবার সময় আরজু খালা বলে গেল, যাইতাছি গো ঢাকাইয়া ভাবি তিন চার দিন আমারে পাইবা, মসল্লা বাটনের লাইগা আইমু গো। বেলেনডারে মসল্লা বাটলেও আরজুর মতো বাটা হইব না, দেখইন যে।

রুবি বলে, এখন যাও আরজু কাল সকাল সকাল এসে যেও। আনন্দের দিনগুলো আসলেই বড্ড তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়। চারটে দিন চলে গেল ঠিক ঝড়ো হাওয়ার মতো, বুকের ভেতরটা কেমন যেন মোচড়

দিয়ে উঠে ইমতির। স্কুলে গেছে। স্যারদের সঙ্গে দেখা করে এসেছে। হাসননগরের রাস্তার পুরনো বট গাছের সামনে গিয়ে বিড়বিড় করে বলেছে, হ্যাল্লো বটগাছ। আমি আবার তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসব যখন অনেক বড়ো হব। একা একা ঘুরতে পারব, তখন দ্যাখো ঠিক তোমার সাথে দেখা হবে আমার প্রমিজ, হেমন্তের মিষ্টি হাওয়া, গরম নেই, শীতও নেই। এ সময়টা ভারি চমৎকার। গাছগাছালিতে দারুণ স্নিগ্ধ এই শহরটি। অথচ কানাডার এডমনটন সিটিতে কেমন করে হুড়মুড় করে শীত নেমে এসেছিল। মাইনাস পঁচিশ, মাইনাস তিরিশ ডিগ্রিতে নেমে এসেছিল টেম্পারেচার। টম, মম অবশ্য বলেছে, এত শীত বলে মনে করো না সবসময় থাকে। উইনটার তো, তাই এমন শীত লাগছে তোমার। সামারে এলে দেখতে টেম্পারেচার প্লাস টুয়েনটি টুয়েনটি ফাইভ-এ নেমে আসে। তুমি আবার এসো ইমতি ভাইয়া, খুব এনজয় করব তখন। সামারে আসবে কিন্তু দারুণ লাগবে। গোপনে করুণ নিশ্বাস ফেলে, স্ট্রিট লাইটের ঝলমলে আলোয় সন্ধ্যার মুখে বাড়ি ফিরছে ইমতি সঙ্গে রাতুল।

কী চমৎকার রাত। ঝকঝকে আকাশে উঠেছে রূপোর থালার মতো চাঁদ, কুয়াশায় কিছুটা আবছা।

রান্নাঘরে রুবি আন্টি রাঁধছে, আম্মু মোড়ায় বসে গল্প করছে। অসীম আঙ্কেল আব্বু জামাই পাড়া, নতুন পাড়া জেল রোড ঘুরে আসবেন। শহরটিকে দেখে দেখে কারোর কি আশ মিটে?

আরজু খালা একাই একশ। মসলা বাটতে বাটতে কথা দিয়ে জমিয়ে রেখেছে গোটা বাড়িটি।

আইজ রাতে পোলাও গোশত রাঁধতাছে গো মায়। পোলাও কোরমা খুশবু ছড়াইব তাইলেই না মাইনষে কইব রাতুল গো বাসায় মেহমান আইছে।

কী যে ভালো খাওয়া হলো রাত্তিরে। প্লেট চেটে পুটে খেয়েও আশ মিটে না কারোর। ইভা বলে, সত্যি রুবি ভাবী যতই আমরা গুঁড়া মশলা দিয়ে রাঁধি বাটা মশলার স্বাদই অন্যরকম। কথাবার্তার মাঝখানেই গুরু গুরু মেঘের মাদল বেজে ওঠে। বিদ্যুৎ ঝলসে উঠে। কুয়াশা আর কালো মেঘের আনাগোনায় চাঁদ হারিয়ে যায় আবার ভেসে ভেসে বেড়ায়। মাঝরাতে টুপটাপ করে টিনের চালে বৃষ্টি ঝরতে থাকে। ঘুম ভেঙে যায় ইমতির। আহ্ কতদিন পর শুনল সে বৃষ্টির টুংটাং সুর। ঢাকায় টিনের চাল কোথায়? সেখানে তো শুধু আকাশ ছোয়া বাড়ি। আজ ৩১ অক্টোবরের হ্যালোইন পার্টি নয়। সারা ইউরোপ জুড়ে এ দিনের রাতে চলে ভূতের উৎসব। সিনড্রেলা, কেয়ারি কুইন অনেকে সাজে, স্পাইডারম্যান, সুপারম্যানের মতো অনেকে সাজগোজ করে। কুমড়ো আর শালগমের তৈরি ভূতের মুখোশ। সেই দিনে পরেছিল টম আর মম সব ছোটোরাই এ রাতে ট্রিক আর ট্রিট, খেলায় মেতে উঠেছিল। ওরা ফ্ল্যাটের সামনে গিয়ে বলেছে, আমাদের খুশি করো নয়ত তোমাদের ভয় দেখাব।

কেউ অবশ্য ভয় পায় না, সবাই বলে, হাও ওয়ান্ডারফুল, ফ্যানটাসটিক ঘোস্ট, কেউ বা ভয়ের ভান করে বলে, আই অ্যাম অ্যাফ্রেইড। এভাবেই ওরা রাশি রাশি চকোলেট হান্টিং করে বেড়ায়। আগে তো হ্যালোইন পার্টিতে কখনও জয়েন করেনি ইমতি, এই কদিন আগে কানাডার এডমনটন সিটিতে গিয়ে জানল দেখল এনজয়ও করল। বিদেশের সেই ভালো লাগা টুকু এই বৃষ্টি ঝরা রাতে বড়ো পানসে মনে হয়। সেদিনের রাতটাকে বড়ো ফিকে মনে হতে থাকে। আধো ঘুম আর আধো জাগার মাঝে সে শুধু শোনে বৃষ্টির সুর। ঘুম ভেঙে যায় ইমতির। আম্মুকে জিজ্ঞেস করে, হেমন্ত ঋতুতে বৃষ্টি হয় মা? হবে না কেন? নেচার হলো খামখেয়ালি, এই যেমন তুমি। ধ্যাত...

ধ্যাত বলিস না, মাঝে মাঝে পেটব্যথা বলে শুয়ে থাকো, ইশকুলে যেতে চাও না, মাঝে মধ্যে লুকিয়ে চুরি করে আচার খাও, আচারের তেল এ মেঝে সয়লাব হয়ে যায়। তাইতো?

আম্মু....

সে কি রে? মায়েরা বুঝি কিছু বুঝতে পারে না, সব বুঝতে পারে। এজন্য বেকার স্ট্রিট থেকে শার্লক হোমস্ -এর মতো ডিটেকটিভকে ছুটে আসতে হয় না।

বেশ, তারপর আম্মু

অঙ্ক কষা বাদ দিয়ে ক্রিকেটের বল আর ব্যাট নিয়ে ছাদে চলে যাও।

সে তো অঙ্ক না মিললে তখন একদম ভাল্লাগে না আম্মু শুধু ফুল পাখি আর আকাশটাকে দেখতে ইচ্ছে করে। কবিতা বলি মা? তখন ফুল পাখি আর আকাশটাকে

দেখতে লাগে ভালো, বই থেকে মোর মন ছুটে যায় আকাশ যখন কালো।

বাহ্...

আম্মুর বুকে মুখ লুকায় সে।

ইভা বলে, তুই হলি আমার প্রকৃতির মতো খামখেয়ালি ছেলে, প্রথমে টুপটাপ এরপর রিনিঝিনি সুরে বৃষ্টি ঝরতে থাকে, এবার এল ঝুমঝুম সুরে। জানালা দিয়ে দেখতে থাকে ইমতি লিকলিকে সাপের মতো বিদ্যুৎ। আমলকি আর কামরাঙা গাছের পাতাগুলো হাওয়ায় দুলছে। বাড়ির পাশে বয়ে যাওয়া খাল দিয়ে যাচ্ছে কোশা নৌকা। উঠোনের একপাশের বাগান থেকে ভেসে আসছে ফুলের মিশেল গন্ধ। নাম না জানা অচেনা কেউ বৃষ্টির রাতে বাঁশি বাজিয়ে যাচ্ছে। ফুলের গন্ধ, বাঁশির সুর আর টিনের চালে ঝরে পড়া বৃষ্টির জলতরঙ্গ ইমতিকে যেন একই সাথে আনন্দ আর কান্নায় ভরিয়ে দেয়। ওহ্ মাই সুইট রেইন, হাউ ওয়ান্ডারফুল ইউ আর। ইভা বলে, জানালাটা বন্ধ করো, বৃষ্টির ছাঁট আসছে যে।

প্লিজ, বৃষ্টির রাতটা আমাকে একটু দেখতে দাও আম্মু। ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ সুর আসছে চারপাশ থেকে।

ওগুলো কিসের আওয়াজ আম্মু।

ব্যাঙের ডাক রে। বৃষ্টি নামলে আনন্দে ওরা গান গায়।

তাই বুঝি ? আমরা এসেছি বৃষ্টিও এসেছে এমনও হয় বুঝি আম্মু?

হ্যাঁ তাই। ব্যাঙের আরেকটা মিষ্টি নামও আছে। দাদুরী।

দাদুরী দাদুরী - ঠোঁট নেড়ে উচ্চারণ করে ইমতি।

ভাবতে থাকে ও। ইশকুলে গিয়ে ক্লাসের বন্ধুদের বলবে, এডমনটন-এ গিয়ে আমি হ্যালোইন পার্টিতে জয়েন করেছি, চকোলেট হান্টিং করেছি, বরফ ঝরা দেখেছি, স্নো ম্যান সেজেছি, ক্যাফেতে গিয়ে নানা রকম ফলের জুস খেয়েছি, বিশাল শপিং মল-এ গিয়ে জামা জুতো গেঞ্জি কিনেছি ব্লা ব্লা ব্লা...

রুবাই, গোল্লা, লাড্ডু, পটকা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করবে ।

তো? কিছুই পছন্দ হয়নি তোর?

হয়েছে তো, আমি অন্য এক রূপকথার শহর দেখেছি। সে শহরে ময়ূরপঙ্খি নাও আছে? তেপান্তরের মাঠ আছে।

না রে, সেসব, কিছু নেই। আমি চারদিনের জন্য বেড়াতে গেছি। হেমন্ত ঋতু, কার্তিক মাসের শেষ, এ সময় কুয়াশা ঝরে, একটু একটু করে শীত আসতে থাকে। সে সময় কি হলো জানিস? ওরা অবাক হয়ে বলবে কি হলো? তুই না বললে আমরা জানব কি করে?

হঠাৎ আকাশে মেঘ করে এল। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকায়, বৃষ্টি নামল ঝমঝম করে। টিনের চালে বৃষ্টি ঝরলে কী যে মিষ্টি সুর বাজে তা তোরা ভাবতেই পারবি না। এই হেমন্ত ঋতুতে আমার জন্যই আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছিল তা জানিস?

তাজ্জব হয়ে যাবে ইশকুলের দুষ্টু ছেলের দল। মুখে তাদের কথা সারবে না। আমাদের যে দেখা হলো না রে ইমতি। বাইরে তুমুল বৃষ্টি নেমেছে। ইমতি ভেবেই চলেছে।

রুবাই বোকা বোকা সুরে বলবে, এমনও বুঝি হয় রে ইমতি ? আব্বু এমন সময় পাশের খাট থেকে জিজ্ঞেস করেন, ভালো লাগছে ইমু?

আব্বু, আমার আব্বু, আমার ড্যাড আমার বেবি কী ভালো তুমি। তুমি ইমতির মনের কথা ঠিক ঠিক বুঝতে পার। মা-বাবারা এখন ঠিক বন্ধুর মতো, সব কিছু বলা যায় ওদের।

আমার চেয়ে অনেকটা বড়ো হলেও মনে মনে ওরা ছোটো হয়ে যান। তাইতো ওরা বুঝতে পারেন ছেলের ইচ্ছের কথা, কি পেতে চায় ইমতি কি পেতে ওর ভালো লাগে।

মধ্যরাতের বৃষ্টি ভেজা এই রাতে প্রিয় শহরে বন্ধুর বাড়ির নরম তুলতুলে বিছানায় শুয়ে আনন্দে আর ভালোবাসায় কান্না পেতে থাকে ওর। পাশের খাটে ঝাঁপিয়ে পড়ে সে। আদুরে হাতে খামচে ধরে আব্বুর শার্ট। কবীরের বুকে কান্নাভেজা মুখ ডুবিয়ে বলে, হ্যাঁ আব্বু, দারুণ লাগছে। ইউ আর গ্রেট আব্বু।

কথাটি বলতে বলতে দশ বছরের ইমতিয়াজ, যে ক্লাস থ্রি-তে পড়ে, ওর চোখ দিয়ে ঝরঝর করে আনন্দ আর আবেগের বৃষ্টি ঝরতেই থাকে।

কবীর বলতে থাকেন, ডোন্ট ক্রাই, চিয়ার আপ মাই বয়।

ভাইবোন

সুজন বড়ুয়া

মিতুদের বাসায় আজ অনেক লোক। মিতুর একটি ভাই হয়েছে। মা ও ভাই কদিন হাসপাতালেই ছিল। আজ হাসপাতাল থেকে বাসায় ফিরেছে। তাই দেখতে এসেছে সবাই। মামা, চাচা, মামি, চাচি, খালা, ফুফু, নানি সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়েছে ভেতরের ঘরে। ওখানেই ভাইকে নিয়ে খাটের ওপর শুয়েছিল মা। বাবা মিতুর সাথে ছিল পাশের ঘরে। এখন নেই। বাবাও ভেতরের ঘরে।

মিতুও পাশের ঘরে ঘুমিয়েছিল। হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভাঙতেই বুঝল ঘরে অনেক অতিথি, যেন হাট বসেছে। অথচ মিতু সেখানে নেই। কেউ তাকে ডাকছেও না। হয়ত কারো মনেই নেই মিতু নামের একটি মেয়ে এ বাসায় আছে। এ কেমন কথা!

একা একা বসে এসব ভাবতে আর ভালো লাগছে না মিতুর। ইচ্ছে হলো ভেতরের ঘরে একটু উঁকি দিয়ে দেখি। ওখানে হচ্ছেটা কী!

ভাবতে ভাবতে মিতু গুটিগুটি পায়ে হাঁটতে থাকে। ভেতরের ঘরের দরজার পর্দার আড়ালে এসে দাঁড়ায়। দেখে কী, শুধু হাট নয়, চাঁদের হাট বসেছে। হাসি আনন্দ আমোদ যেন উপচে পড়ছে। কী না হচ্ছে সেখানে।

তোয়ালে দিয়ে জড়ানো ভাইকে একবার ও কোলে নিচ্ছে তো আরেকবার ও। আর বলছে দেখতে একেবারে চাঁদের মতো হয়েছে। কে যেন বলল, আরে না, চাঁদের মতো নয়, গোলাপ ফুলের মতো। দেখো না কেমন গোলগাল।

এসব দেখেশুনে যেন মিতুর গা জ্বলে উঠল। ঢং দেখে আর বাঁচি না! এতদিন তোমরা এই মিতুকে নিয়েই এসব করেছ। এখন মিতু তোমাদের কেউ নয়! ওই পিচ্চিটাই সব! থাকো তোমরা ওকে নিয়ে।

দরজা থেকে ফিরে আসছিল মিতু, এমন সময় তার চোখে পড়ল, টেবিলের ওপর কতগুলো খেলনা ও জামাকাপড়। আচ্ছা, পিচ্চিটার জন্য আবার এসবও আনা হয়েছে! আমার জন্য কিছুই না!

মিতুর ছোটো বুকটা যেন এবার ফেটে যাওয়ার জোগাড়। কোনোমতে কান্না চেপে ফিরে এল সেখান থেকে। পাশের ঘরের বিছানায় উঠে বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে রইল চুপচাপ।

বুয়ার ডাকাডাকিতে যখন মিতু জেগে উঠল তখন বেশ রাত। বিছানায় শোয়ার পর কখন যে ঘুম এসে গিয়েছে বুঝতে পারেনি। এর মাঝে বাসা ফাঁকা। অতিথিরা সবাই যে যার বাসায় ফিরে গেছে। কেউ তাকে ডাকেনি।

বুয়া মিতুকে ডেকে বলল, খাবে, এসো।

মিতু উঠতে চাইছিল না। কিন্তু বুয়ার ডকাডাকিতে না উঠে পারল না। খাবার টেবিলে এসে দেখে বাবা বসে আছে। আজ বাবা-মা কেউ তাকে খেতে ডাকেনি। হঠাৎ যেন কেমন হয়ে গেল সব।

রাতে খেয়ে মিতু আবার শুয়ে গেল চুপচাপ। সকালেও ডেকে তুলল বুয়া। ভ্যানে করে গেল ইশকুলে, ফিরে এল দুপুরে। মিতু ক্লাস থ্রিতে পড়ে। আগে ইশকুলে আনা নেওয়া করত মা। ইশকুলে থেকেই মাঝখানে টিফিন খাওয়াতো নিজের হাতে। সেই মা এখন পড়ে আছে ভাইকে নিয়ে। ভাবলে মিতুর কেমন যেন লাগে।

কদিন যেতে না যেতেই আরো নতুন কিছু দেখল মিতু। ভাইয়ের নাম রাখা হয়েছে তার নামের সাথে মিলিয়ে–পৃথু। বাবা-মার মাঝখানে আগে ঘুমাতো মিতু। এখন সেখানটায় ঘুমায় ভাই। ইচ্ছে হলেই এখন মা-বাবাকে একসাথে জড়িয়ে ধরতে পারে না মিতু। এ জন্য বুকটা হাহাকার করে ওঠে হঠাৎ।

আরো কদিন পরের কথা। গ্রাম থেকে বেড়াতে এসেছে দাদিমা। এসেই কোলে টেনে নিল ভাইকে। আর যেন কোল থেকে নামানোর নাম নেই। অথচ আগে এই দাদির বুকের সব আদর ছিল শুধু মিতুর জন্য। শেষে কিনা দাদিও বদলে গেল এমন! ভাইয়ের মাঝে কী পেল সবাই! ভাইকে পেয়ে সবাই এমন দূরে ঠেলে দিল আমাকে! পিচ্চিটাই আমার সব আনন্দ-সুখ কেড়ে নিল!

দেখতে দেখতে দুবছর কেটে গেল। ছোটো ভাই পৃথু এখন কথা বলতে শিখেছে। সারাক্ষণ আপু ডেকে ডেকে অস্থির করে তোলে মিতুকে। আর জড়িয়ে ধরতে চায় যখন তখন। ভাইয়ের কচি গলায় আপু ডাক শুনতে ভালোই লাগে মিতুর। কিন্তু যখনই কোলে নিতে হাত বাড়ায়, তখন মনে পড়ে এই পিচ্চিটাই বাসায় তার সুখ-আনন্দ সব শেষ করে দিয়েছে। অমনি ভাইকে কোলে নেওয়ার ইচ্ছে উড়ে যায় তার। আর কোলে নিতে পারে না সে।

আরো ছয় মাস পরের কথা। একদিন সন্ধ্যাবেলা। বাবা-মা গেছে ডাক্তারের কাছে। বুয়া গেছে গ্রামের বাড়ি। অঝোর ধারায় বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে। বাজ পড়ছে থেকে থেকে। বাসায় এখন শুধু ভাইবোন দুজন। বাতি জ্বালিয়ে পড়ার টেবিলে বই খুলে বসেছে মিতু। পাশেই বসে আছে ছোটো ভাই পৃথু। হঠাৎ কী হলো কে জানে। ভাইকে জড়িয়ে ধরে দালানকোঠা কাঁপিয়ে চিৎকার করে উঠল মিতু–ভূ-উ-ত।

আপুর কাণ্ড দেখে নড়েচড়ে বসল ছোটো ভাই। শান্ত গলায় বলল, কোথায় ভূত?

ওই যে ডাইনিং টেবিলের নিচে, জ্বলজ্বল চোখে তাকিয়ে আছে। মিতু ভাইয়ের মাথার আড়ালে চোখ লুকিয়ে বলল।

ছোটো ভাই পৃথু আবারো ধীর গলায় বলল, ওটা ভূত নয় আপু, বেড়াল। তুমি বেড়ালকে ভয় পাও!

মিতু এবার কোনোমতে চোখ তুলে তাকায়। লজ্জা পাওয়া গলায় বলে, বেড়াল!

বলতে বলতে ভাইকে এবার সত্যিকারের আদরে কোলে টেনে নেয় মিতু। মনে মনে বলে, ভাগ্যিস, ভাইটি সাথে ছিল, তা না হলে আজ কী যে হতো!

ঈদ গল্প-৩

ঈদ এবং হিমু সমাচার

রফিকুর রশীদ

দেখতে দেখতে ঈদ এগিয়ে আসছে। আমি আর আমার ফুপাতো ভাই মিল্টন প্রতিদিনই আঙুল গুনে হিসাব মেলাই আর মাত্র আট দিন বাকি। আজ রবিবার, ঈদ হবে আগামী রবিবারে। কখনো বা রোজার হিসাব মেলাই সাত রোজা বাকি ছয় রোজা বাকি। আমরা দুজনে পরিকল্পনা আটি, সাতাশে রমজান আমরা ঠিকই রোজা রাখব। আষাঢ়-শ্রাবণের রোজা ছোটোদের জন্যে খুবই কষ্টের। বাপরে বাপ, চৌদ্দ-পনেরো ঘণ্টার টানা দিন। বেলা যেন গড়াতেই চায় না। গলা শুকিয়ে কাঠ। আমাকে রোজা রাখতে দেখলে আমার ছোটো বোন মারিয়াও ঝুল ধরে, সেও রোজা রাখবে। মা তাকে মিছিমিছি সান্ত্বনা দেয় রোজার মাসে তোমার তো রোজা হচ্ছেই, প্রতিদিন তিন-চারটি করে রোজা হয়। ছোটোদের বেলায় যতবার খাওয়া হবে, ততটাই রোজা। একথা মারিয়ার বিশ্বাস হয় কি না হয় কে জানে, আমার দিকে তাকিয়ে মিটমিট করে হাসে। আমি অতি দ্রুত ঘাড় নেড়ে সমর্থন জানাই রোজ দু'তিনটি রোজা তো হয়ই। আমার আব্বা গ্রাম্য মাদ্রাসার শিক্ষক। এসব হাসিতামাশা পছন্দ করেন না। তিনি স্পষ্ট ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন সাতাশে রমজান শবেকদর, এ দিন সবাইকে রোজা রাখতে হবে। লাইলাতুল কদরের তাৎপর্য বুঝিয়ে বলেছেন, এটি হচ্ছে হাজার রাতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ রাত। সহস্র রজনির ইবাদতের ফল এই এক রাতের ইবাদতেই পাওয়া সম্ভব। তাই রোজা রাখার সঙ্গে নামাজও পড়তে হবে। মিল্টনের সঙ্গে আমি যুক্তি পরামর্শ করে রাখি আসুক সবাই গুছিয়ে। দলবলের সবাই মিলে এক সঙ্গে রোজা রেখে আব্বাকে চমকে দেবো, বুঝিয়ে দেবো শবেকদরের রোজা কাকে বলে।

কিন্তু আমাদের দলবলের হলোটা কী! ঈদ যে এসে গেল প্রায়। এখনো কারো খবর নেই। অথচ আমার দাদু সবাইকে আগেভাগে চলে আসতে বলেছেন। তিনি এবার হজে যাবেন। এই ঈদের কিছুদিন পর হজ যাত্রীদের প্রথম দল রওনা হবে। দাদুও সেই দলে যুক্ত হতে চান। যে সময় তিনি দেশ ছেড়ে যাবেন, তখন কী সবার ছুটিছাটা মিলবে? আমার চাচা এবং ফুপুরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন দেশের নানান জায়গায়। কেউ খুলনা, কেউ দিনাজপুর, বড়ো চাচা থাকেন সিলেটে। ঈদের মতো উৎসব ছাড়া সবাইকে একত্রে জড়ো করা কি সোজা কথা। দাদু মোবাইল ফোন ব্যবহারে অভ্যস্ত নন, আমার আব্বা তবু নম্বর টিপে টিপে মোবাইল ধরিয়ে দেন তার হাতে। আমি দেখেছি এবং দিব্যি শুনেছি, দাদু সবাইকে বলেছেন ঈদের এক সপ্তাহ আগেই চলে আসতে। তারপর আমার আব্বাকেও ফোনে কথা বলতে শুনেছি। ফুপুকে, চাচাকে সবাইকে তিনি ডাকছেন তাড়াতাড়ি চলে এসো। এত ডাকাডাকির ফল হলো কী। ঈদ তো চলেই এল ! এখনো কারো পাত্তাটি নেই। আব্বা সকালে উঠেই মোবাইলে খোঁজ নেন। দেরি হচ্ছে কেন? কে কবে রওনা হচ্ছে জানতে চান। আমাদের গ্রামের রবিউল মামা উপজেলা শহরে অটোরিকশা চালায়, তাকে বলা আছে আমার চাচা-ফুপুরা বাস স্ট্যান্ডে নামলেই সে বাড়ি নিয়ে আসবে। কিন্তু সত্যি সত্যি কারো খবরই হচ্ছে না। যদি কেউ গাংনী বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত এসে না পৌঁছে, তাহলে সে কী করবে। দিনের শেষে আমার সঙ্গে দেখা হলে হাত নেড়ে জানিয়ে দেয় আসেনি মামু, কেউ আসেনি। আমার খুব মন খারাপ হয়ে যায়। মিল্টনকে শুধাই, কী করা যায় বল দেখি। মিল্টনও আমার ফুপাতো ভাই। পাশের গ্রামে বাড়ি। আমরা একই ইশকুলে পড়ি। সারাদিন একসঙ্গে ঘুরি। ভাই হলেও সে আমার প্রিয় বন্ধু। মিল্টনের মা ময়না ফুপু আমাদের দু'জনকেই খুব ভালোবাসেন। চাচাতো বোন হলেও আমার আব্বা ঈদের আগে ময়না ফুপুকেও এ বাড়িতে নিয়ে আসবেন সে কথা আমি জানি। মিল্টন

তো মায়ের জন্যে অপেক্ষা করে না, দিনরাত সে আছে আমার সঙ্গেই। সে-ই সহসা বুদ্ধি দেয় ফোন করলে হয় না? কাকে ফোন করব? আমি জানতে চাই। মিল্টন প্রথমে বলে, যার যার ফোন নম্বর জানা আছে, সবাইকে ফোন করতে হবে। পরক্ষণেই সিদ্ধান্ত পালটে বলে, না থাক, আগে হিমু ভাইয়ের খবরটা নেওয়া যাক। নম্বর আছে না তার? হিমু ভাই মানে আমার বড়ো চাচার বড়ো ছেলে। হুমায়ূন কবির। এই নামে এই দেশে এক কবি ছিলেন। একদা তিনি নাকি মন্ত্রীও হয়েছিলেন। বড়ো মাপের সেই মানুষটির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে নিজের ছেলের নাম রেখেছেন আমার চাচা। কিন্তু হুমায়ূন কবির হবার কোনো আকাঙ্ক্ষা হিমু ভাইয়ের নেই। সে হতে চায় হিমু। পড়ে ক্লাস টেনে। এরই মধ্যে হুমায়ূন আহমেদ, জাফর ইকবালের অনেক বই পড়া শেষ। দু'বছর আগেই হিমু হবার জন্যে হলুদ জামা গায়ে দিয়ে তাকে বিস্তর লাফালাফি করতে দেখা গেছে। শহরে থাকে, তবু কেমন যেন বন্য স্বভাব তার। বছর দুয়েক আগে যখন বাড়ি এসেছিল, আমাদের সবাইকে নিয়ে দলবেধে কাজলা নদীর পাড়ে বনবাদাড়ের মধ্যে সে কী অ্যাডভেঞ্চার। খরগোশের পেছনে ছুটে যায়, পাখির বাসা থেকে ডিম পেড়ে আনে। আরো কত কী। সেই হিমু ভাই দু'বছর পর বাড়ি আসছে। এমনিতেই আমাদের অপেক্ষা আর উত্তেজনার শেষ নেই, সেই সঙ্গে হিমু ভাই আরো চমক লাগিয়েছে এক জোড়া ময়নার লোভ দেখিয়ে। চট্টগ্রামে বেড়াতে গিয়ে আমাদের মারিয়ার জন্যে নাকি দুটো ময়না কিনে এনেছে। বুনো ময়না, পোষ মানালেই আপন হবে, কথা বলবে। বেশ কদিন আগে আব্বাকে নাকি মোবাইলে এ সব কথা সে জানিয়েছে। আমরা এখন সেই মোবাইল নম্বর পাই কোথায়? আব্বা কী বলবেন। মাথা খারাপ। এরই মাঝে বড়ো ফুপু তার দুই মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে চলে এলেন তার বাপের বাড়ি। ফুপা আসবেন আরো তিনদিন পর। ঈদ বোনাস নিয়ে পাটকলে চলছে তীব্র অসন্তোষ। সে সবের একটা কিনারা না করে মিলের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার ছুটিতে আসতে পারে না। রিনা আপু তো ঠোঁট উলটিয়ে জানায় আব্বুর কথা বাদ দাও। ঈদের আগের রাতেও তিনি আসতে পারেন। বীনা আপুর রিপোর্ট আরো ভয়াবহ। ঈদের দিন কিংবা ঈদের পরদিন বাড়ি যাবার দৃষ্টান্তও নাকি তার আছে। তবে এবার স্বয়ং শ্বশুর সাহেব ডেকেছেন, নিশ্চয়ই ঈদের আগেই আসবেন। বড়ো মামা মেজো মামা এমন কী যশোর থেকে ছোটো খালাও এখন পর্যন্ত আসেনি বলে রিনা-বীনাও খুব অবাক। রিনা আপু খুলনা বিএল কলেজের ছাত্রী, খটমটে স্বভাব, আমি জানি তাই বীনা আপুর কাছে জানতে চাই তোমরা কী বড়ো চাচার ফোন নম্বর জানো আপু? মানে বড়ো মামার? হিমু ভাইয়ার হলে বেশি ভালো হয়। হিমু। হুমায়ূনকে তোরা সত্যিই হিমু ডাকিস? হিমু ভাইয়া বলি। তার মানে তোদের সবাইকে ভূতে ধরেছে। হিমু ভূতে। কী যে বলো না আপু। হিমু ভাইয়া নিজেই তো হিমু হতে চায়। 'আহা, তার বাবা-মা তো ওই নাম রাখেনি। সে একা হিমু সাজলেই হবে। ও ফোন নম্বর। দাঁড়া, মাকে জিজ্ঞাসা করে দেখি।' বীনা আপুর কথায় হঠাৎ আমার মাথায় রাগ চড়ে যায়। আমি বলে উঠি তোমাকে আর দেখতে হবে না। আমিই ফুপুকে শুধাচ্ছি। হিমু ভাইয়া কিংবা বড়ো চাচার ফোন নম্বর সংগ্রহ হতে না হতে এদিকে অন্যরকম এক ঘটনা ঘটে বসে। আমাদের মারিয়ার নামে একটা চিঠি এসে হাজির। হ্যাঁ, রীতিমতো পোস্ট অফিসের সিলমোহর লাগানো মুখ বন্ধ করা খামের চিঠি। উপরে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা মারিয়া ইসলাম। প্রযত্নে- মো: মাঈনুল ইসলাম, গ্রাম- শান্তিডাঙ্গা। মারিয়ার নামে চিঠি। কে না অবাক হবে। ও কি পড়তে জানে?

সবগুলো অক্ষর চেনে? নিজের নাম লিখতে জানে? আমাদের বাড়িতে কতদিন পরে চিঠি এল ওই ছোট্ট মেয়ের নামে। কে লিখেছে চিঠি? কী লিখেছে? খামের মুখ খোলার আগে সবার মুখে চলে বিস্তর গবেষণা। বাড়িতে আর মানুষ নেই? মারিয়ার নামেই চিঠি দিতে হলো? ব্যাপারটা কী? অবশেষে এল চিঠি খোলার পালা। বাজার থেকে আসার পর আব্বা আমার হাতেই তুলে দিয়েছিলেন চিঠিটি। পড়তে পারুক আর না পারুক, আমি সেটা মারিয়াকে দেই ছুঁয়ে দেখতে, নেড়েচেড়ে দেখতে। কিন্তু সে চিঠি খুলে পড়ার সময় রিনা আপু ছোঁ মেরে সেটা তুলে নেয় নিজের হাতে। তারপর দু আঙুলে চিমটি কেটে খামের মুখ ছিঁড়ে ফেলতেই বেরিয়ে পড়ে চমৎকার একটি ঈদ কার্ড। সেই কার্ডের মাঝখানে রঙিন প্রজাপতি, আর দুইপাশে ঈদের চাঁদ এবং মসজিদের মিনারের ছবি শোভা পাচ্ছে। ছাপার অক্ষরে লেখা ঈদ মোবারক। তার নিচে কলম দিয়ে লেখা আসছি, আমরা আসছি। কোনো নাম স্বাক্ষর নেই। এভাবে নিজের নাম লিখতে কেউ ভুলে যায়? নাকি রহস্য করার জন্যে ইচ্ছে করেই নাম লেখেনি। আমরা আসছি, লিখলেই হলো। আমরা মানে কারা? সম্ভাবনার দিক বিবেচনা করে শুরু হয় নানারকম মন্তব্য। শেষে হাতের লেখা নিয়েও চলে চুল চেরা বিশ্লেষণ। কার হাতের অক্ষর গঠন কী রকম তাই নিয়ে চলে তর্ক। বীনা আপু স্পষ্ট মন্তব্য করে এ হচ্ছে মেয়েলি হাতের লেখা, নির্ঘাত এটা সুমীর কাজ। সুমী আমার মেজো চাচার মেয়ে। দিনাজপুর থেকে তারা রওনা দেবে আগামী পরশু। আজ সকালেও নাকি মেজো চাচার সঙ্গে কথা হয়েছে আব্বার। ব্যাংকের চাকরিতে ছুটি কম। আসতে আসতে শবেকদর। কিন্তু সুমীর কথাই বা উঠছে কেন? বড়ো চাচার মেয়ে হিরা আপুর হাতের লেখা কি মেয়েলি নয়? এমন কী হিমু ভাইয়ের হাতের লেখাও অনেকটা হিরা আপুর মতোই। ভাইবোনের লেখা কি কাছাকাছি হয় না? আমার তো মনে হয় ওদের দু'ভাই বোনের মধ্যেই কেউ একজন এ কাজ করেছে। হঠাৎ ঝগড়া বাধায় মিল্টন। তার ধারণা এ লেখা

চামেলি

খালার ছেলে রিশাতের। মেজো ফুপুকে মিল্টন চামেলি খালা বলে। মিল্টন যে কেমন করে রিশাতের হাতের লেখা এত নিবিড় ভাবে চিনেছে সেও এক রহস্য বটে। দিব্যি সে জোর দিয়ে বলে, এ রিশাতেরই কাজ। রিশাতরা শান্তিডাঙা চলে এল পরদিন বিকেল নাগাদ। ঈদ কার্ড নিয়ে আমাদের তর্কবিতর্কের গল্প শুনে তো হাসিতে গড়িয়ে পড়ে। মিল্টনই ঢাকে চেপে ধরে, এত হাসছ কেন ভাইয়া, হাতের লেখাটা কি তোমার নয় রিশাত আবারো হাসে। প্রায় সমবয়সি বলে মিল্টন আগে কখনো তাকে ভাইয়া বলেনি। এখন রিশাতকে দলে নেওয়ার জন্যে সে অনায়াসে ভাইয়া বলে ডাকে। তবু কাজ হয় না। হাসি থামিয়ে রিশাত বলে চিঠি এল কোত্থেকে সেটা দেখতে হবে না? কোত্থেকে এল, সেটা কী করে জানা যাবে? গাধা কোথাকার! খামের গায়ে পোস্ট অফিসের সিল দেখলেই হলো! তাই তো! তাই তো। সবাই মিলে হুমড়ি খেয়ে পড়ে খামের উপরে। কিন্তু কী যে দুর্ভাগ্য কালো কালিতে ধ্যাবড়ানো সিলমোহর থেকে কিছুই পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয় না। অস্পষ্ট দু'একটা অক্ষর যদিও উদ্ধার করা যায়, তা নিয়েও শুরু হয় নতুন বিতর্ক। একমত হতে পারে না কিছুতেই। অগত্যা কী আর করা, সিদ্ধান্ত হয় আসুক সবাই, তারপর জানা যাবে ঈদ কার্ড কে পাঠিয়েছে, কোথা থেকে এসেছে। নিজের নাম না লিখে কার্ড পাঠানোর মজা দেখানো হবে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই মজা দেখানো আর হলো কই! শবেকদরের দিন নাগাদ দূরদূরান্ত থেকে প্রায় সবাই এসে গুছিয়ে গেল আমাদের শান্তিডাঙার গ্রামের বাড়িতে। ছোটো বড়ো নারী পুরুষ সবাই মিলে সে কী আনন্দ-কোলাহল। আমার দাদু বোধ হয় এমন আনন্দময় দৃশ্যই দেখতে চেয়েছিলেন। তবু তিনি চোখের উপরে হাত তুলে রোদের বিপরীতে দাঁড়িয়ে পথের দিকে তাকিয়ে থাকেন তার বড়ো ছেলে এল না যে। মোবাইল ফোনে বড়োদের মধ্যে কী যে কথা হয় আমি জানি না, তবে হঠাৎ করেই যেন আনন্দ বেলুন চুপসে যায়। বড়োদের মুখে থমথমে ছায়া। ছোটোদের সামনে ভালো করে কেউ মুখ খুলতেই চায় না। আমরা এটুকু ঠিকই বুঝতে পারি, কোথাও একটা অঘটন ঘটেছে। পরদিন বড়ো চাচা বিষণ্ন মুখে বাড়ি এলেন একা একা। সঙ্গে হিমু ভাই, হিরা আপু, বড়ো চাচি কেউ নেই। সবাইকে রেখে তিনি একা এসেছেন পিতৃআজ্ঞা পালন করতে। বড়ো চাচিকে আমরা বড়ো মা বলে ডাকি। আমাদের সবাইকে তিনি খুব ভালোবাসেন। ছোটোদের জন্যে কতরকম চকলেট যে সঙ্গে নিয়ে আসেন তার ঠিক নেই। সেই মমতাময়ী বড়ো মা নেই। হিমু ভাইয়া নেই। হিরা আপু নেই। ময়না পাখি নেই। সব ফেলে বড়ো চাচা একা এসে জানালেন দুর্ঘটনার কথা। এ ঘটনার নায়ক হুমায়ূন কবির, মানে আমাদের হিমুভাই। বাড়ি আসার আগে তার কত যে প্রস্তুতি। এক জোড়া ময়না তো আছেই, শহর থেকে কিনেছে লাটাই ঘুড়ি, অনেক গুলো কাচের মার্বেল এবং হলুদ রঙের এক ডজন মাথার ক্যাপ, ওই ক্যাপ পড়িয়ে সবাইকে সে হিমু বাহিনির সদস্য বানিয়ে নেবে। আরো কতরকম পরিকল্পনা যে তার মাথায় টগবগ করে ফোটে, কে জানে সেই খবর। সব পরিকল্পনা ভণ্ডুল হয়ে গেল গত পরশু এক মোটরসাইকেল অ্যাক্সিডেন্টে।

হিমু ভাইয়ার দোষ নেই, সব কেনাকাটা হয়ে যাবার পর তার মনে পড়ে রঙিন বেলুনের কথা। ঈদের দিন সারা বাড়িতে রঙিন বেলুন উড়িয়ে দিতে হবে। সেই বেলুন নিয়ে রাস্তা পেরুনোর সময় দ্রুতগামী এক মোটরসাইকেলের সঙ্গে ধাক্কা লেগে বাম পা ভেঙে ফ্রাকচার। তারপর হাসপাতাল, এক্সরে, ব্যান্ডেজ এই সব নিয়ে ছোটাছুটি। বিবরণ শুনে আমাদের খুব মন খারাপ হয়ে যায়। ঈদকে আনন্দময় করে তোলার জন্যে এত যার প্রস্তুতি সেই মানুষটারই আসা হলো না। প্লাস্টার মোড়া পা নিয়ে সে থাকল সিলেটে, আমাদের ঈদে আনন্দ হবে কী করে। বড়ো চাচা আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে বলেন তোমাদের জন্যে কেনা সে সব বেলুন- ঘুড়ি কিছুই আমি নিয়ে আসিনি। এনেছি কয়েকটা ঈদ কার্ড। 'ঈদ কার্ড।' আমরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাই। মারিয়া সামনে এসে জানায়, আমাকে তো ঈদ কার্ড পাঠিয়েছে ভাইয়া। বড়ো চাচা এতক্ষণে মৃদু হাসেন। তারপর ব্যাগের ভাঁজ থেকে ঈদ কার্ড বের করতে বলেন, শুধু এক বোনকে দিলে হয়, আরো ভাইবোন আছে না তার।' বড়ো চাচা জানান, হিমু ভাইয়া জোর খাটিয়ে ঈদ কার্ডগুলো আনিয়ে নিজের নাম সই করে তার ব্যাগে ঢুকিয়ে দিয়েছে। আমরা একে একে ঈদ কার্ড গ্রহণ করি বড়ো চাচার হাত থেকে। হিমু ভাইয়ের ঈদের শুভেচ্ছা। কার্ড খুলে আমরা চমকে উঠি মারিয়ার কার্ডে লেখা এ তো সেই একই হাতের লেখা।

বৃষ্টি

মো. রায়ান কামাল

বৃষ্টি হচ্ছে টাপুস টুপুস
খিচুড়ি মজা হাপুস হুপুস
বৃষ্টির জলে নদী ভাসে
মাঠ হাসে সবুজ ঘাসে।

প্রথম শ্রেণি, লিটল জুয়েলস নার্সারি ইনফ্যান্ট অ্যান্ড জুনিয়র স্কুল, পুরানা পল্টন, ঢাকা

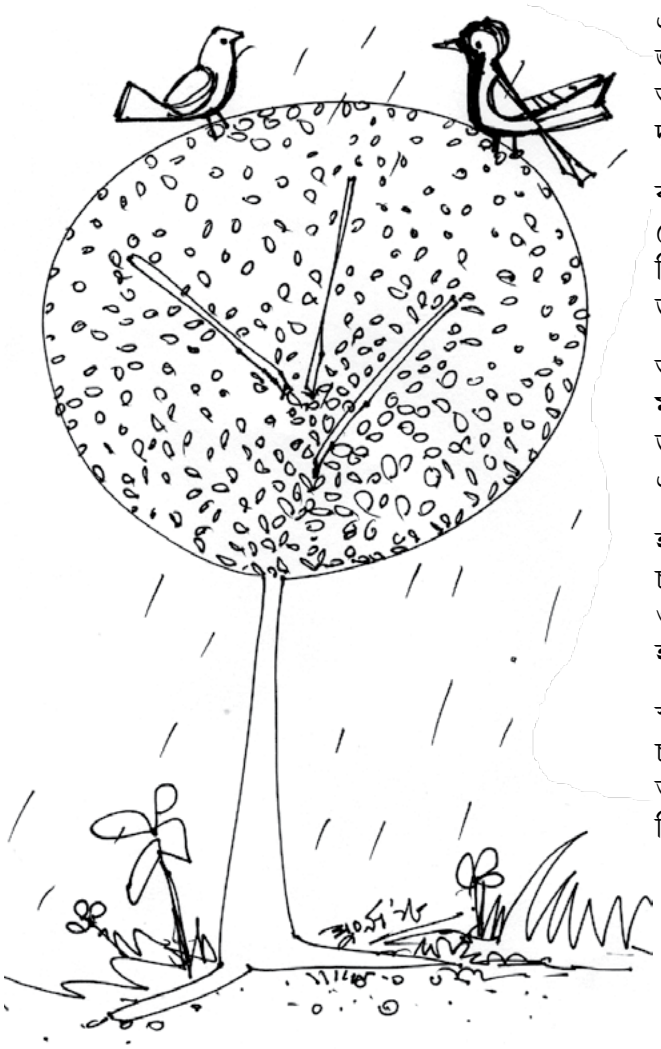

পাখি আমি

রেবেকা ইসলাম

এই তো সেদিন হয়ে গেলাম শ্যামপাপিয়া পাখি
জারুল ডালে বসে বসে সুর ছড়িয়ে ডাকি
আমায় দেখে আসে ছুটে আমারই এক সাথি
দুজন মিলে ডালে ডালে করি মাতামাতি।

বলল সাথি,বিলে যাবি কিচির মিচির সুরে
হোগলা বাঁশের বন পেরিয়ে একটু খানিক দূরে
বিলে শত মাছের মেলা টেংরা,টাকি,পুঁটি
ডাহুক,ধনেশ,জলপিপিরা করছে ছুটোছুটি।

আমরা দুজন উড়াল দিলাম মনের সুখে খুব
মাছরাঙাটা থেকে থেকে দিচ্ছে খালি ডুব
ডুবিয়ে দিলাম ঠোঁট দুজনা বিলের কালো পাঁকে
একটা পুঁটি আটকে গেল আমার ঠোঁটের ফাঁকে।

হঠাৎ দেখি শিকারি এক গুলতি করে তাক্
চমকে গিয়ে পালিয়ে গেল পাখির যত ঝাঁক!
ওদের সাথে আমরা ছুটি পেরিয়ে সবুজ ভূম
হতাশ বুকে ছটফটানি ভেঙে গেল ঘুম।

স্বপ্ন ভেঙে আমি দেখি বিছান পরে কাত
চারিদিকে আঁধার কালো নিকষ গভীর রাত
তখন আমি হলাম যেন ফুঁসলে ওঠা নাগ
শিকারিটার ওপর হলো আমার ভীষণ রাগ !

সেকালের গল্প

খন্দকার মাহমুদুল হাসান

কোটি কোটি বছর আগের কথা। হিমালয় এবং আলপ্‌সের মতো অনেক পবর্তমালাই তখনো ছিল না পৃথিবীতে। আর দুনিয়ার চেহারাটাই ছিল অন্যরকম। আজকের দিনের মতো এতগুলো মহাদেশের অস্তিত্বও ছিল না তখন। মহাসাগরের অথৈ জলে ভেসে ছিল একটি মাত্র মহাদেশ। সেই মহাসাগরের নাম ছিল প্যান্থালাসা মহাসাগর, মহাদেশটার নাম পাঙ্গিয়া। আরো অনেক পরে একমাত্র মহাদেশটি ভেঙে হলো দুটো মহাদেশ। উত্তরের লরেশিয়া আর দক্ষিণের গন্ডোয়ানল্যান্ড নামের এই দুটো মহাদেশের নড়াচড়া শুরু হলো। এক সময় এই মহাদেশ দুটো বিপরীত দিক থেকে পরস্পরের দিকে ধেয়ে গেল। ফল যা হবার তাই হলো। দুই মহাদেশের মধ্যে সংঘটিত হলো মহাসংঘর্ষ। সেই সংঘর্ষে বদলে গেল গোটা পৃথিবীর মানচিত্রই।

দুই মহাদেশের সংঘর্ষের ফলেই সৃষ্টি হলো নতুন এক মহাপর্বতমালা, নাম তার হিমালয়। এই পর্বতমালাতেই রয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু শৃঙ্গ এভারেস্ট। এই পর্বতমালা যে সাগরতল থেকে মাথা উঁচিয়েছে তার প্রমাণও ছড়িয়ে আছে এর সব জায়গায়। এই পর্বত শীর্ষ এবং এই যে এভারেস্ট শৃঙ্গ, তা চুনাপাথরের। আর চুনাপাথরের সৃষ্টি হয়েছে সমুদ্রতলের মৃত প্রাণীদেহের ক্যালসিয়াম জমে জমে। চুনাজাতীয় জিনিসে তৈরি বলে এই পাথরকে বলে চুনাপাথর। এই পর্বতমালা সৃষ্টি হওয়ার আগে এই পাথর ছিল মহাসাগরের গভীরে। তবে এটি ছাড়াও অকাট্য প্রমাণ আছে। কী সেই প্রমাণ? সে হলো ফসিল-প্রমাণ। বাংলায় একে বলা যায় জীবাশ্ম-প্রমাণ। এখন কথা হলো ফসিল কী, আর জীবাশ্মই বা কী?

আসলে ফসিল যা, জীবাশ্মও তা। ফসিল বলে ইংরেজিতে আর বাংলায় বলে জীবাশ্ম। 'জীব' এবং 'অশ্ম' কথা দুটো মিলে হয়েছে জীবাশ্ম। জীব হলো যার জীবন বা প্রাণ আছে সে। আর 'অশ্ম' মানে পাথর বা পাথুরে কিছু। তাই জীবাশ্ম হলো জীবদেহের পাথরে পরিণত অবস্থা। বহুকালের ব্যবধানে প্রাণী বা উদ্ভিদের মৃতদেহ সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে পাথরে পরিণত হতে পারে। কাদামাটিতে পড়া মৃতদেহের ছাপও এক সময় পাথরে পরিণত হতে পারে। আধুনিক কার্বন ডেটিং পদ্ধতিতে ওই সব ফসিলে পরিণত জীব কত লক্ষ বা কত কোটি বছর আগে বেঁচে ছিল তাও জানা যাচ্ছে।

এবারে জানা

যাক, হিমালয়ের সাগরতল থেকে মাথা তোলার পক্ষে কী এমন ফসিল বা জীবাশ্মর প্রমাণ আছে? হ্যাঁ প্রমাণ আছে। হিমালয়ের গায়ে কোটি কোটি বছর আগেকার বহু সামুদ্রিক প্রাণীর ফসিল পাওয়া গেছে। কাজেই এই পর্বতমালা যে এক কালে সমুদ্রতলে ছিল তাতে কোনো ভুল নেই।

অবশ্য হিমালয় সৃষ্টির সময় পৃথিবীতে কোনো মানুষ ছিল না। আমাদের বাংলাদেশটাও ছিল সাগরজলের নিচে। এরপর কোটি কোটি বছর ধরে নদীর জলে মিশে নুড়ি-পাথর-মাটি এসব এসে সাগরজলে পড়তে পড়তে এবং প্রাণী আর উদ্ভিদের মৃতদেহ মিশতে মিশতে সাগরতলের উচ্চতা বাড়তে লাগল। অনেক বড়ো বড়ো ভূমিকম্প হলো। এসব নানান ঘটনার

পথ বেয়ে সাগরজলের বুক থেকে ধীরে ধীরে মাথা তুলতে লাগল বাংলা ভূখণ্ড। এই ভূখণ্ডের মধ্যে যেমন বাংলাদেশ আছে, তেমনি আছে বর্তমানে ভারতের অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গও। যখন থেকে বাংলা ভূখণ্ড সৃষ্টি হতে শুরু করেছিল, তখনো কিন্তু পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব ঘটেনি। অর্থাৎ সেটাও ছিল কোটি কোটি বছর আগেরকার ব্যাপার।

এখন প্রশ্ন হলো, বাংলাদেশের কোন্ জায়গাগুলো সবচেয়ে আগে সৃষ্টি হয়েছিল? পণ্ডিতরা অনেক গবেষণা করে আবিষ্কার করেছেন যে, যেসব জায়গার মাটি লাল সেসব জায়গাই সৃষ্টি হয়েছে সবচেয়ে আগে। বাংলা ভূখণ্ডের বাংলাদেশ শুধু নয়, পশ্চিমবঙ্গেরও অনেক এলাকার মাটির রং লাল। এর মধ্যে খুব পুরনো হলো ছোটো নাগপুর মালভূমি। এই মালভূমি অবশ্য শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়- ঝাড়খণ্ড, বিহার, উড়িষ্যা ও ছত্তিশগড় রাজ্যগুলো জুড়ে আছে। বিশেষভাবে উল্লেখ্যযোগ্য হলো পুরুলিয়া জেলা। পশ্চিমবঙ্গ ও তার নিকটবর্তী প্রাচীন লালমাটি এলাকার মধ্যে আছে মেদিনীপুরের পশ্চিমের গৌরিক মালভূমি, রাজমহল, সিংভূম, মানভূম, ধলভূম, সাঁওতালভূম, দার্জিলিং প্রভৃতি এলাকা। আর বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন লালমাটি এলাকার মধ্যে আছে চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট, ময়মনসিংহের পাহাড়ি এলাকা। তবে পুরো লালমাটি এলাকা আরো বিস্তৃত। যেমন উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্রভূমির লালমাটি এলাকা, ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইলের মধুপুর গড় এলাকা, ঢাকা-গাজীপুরের ভাওয়াল গড় এলাকা, কুমিল্লার লালমাই এলাকা। নরসিংদী জেলার উয়ারি বটেশ্বরও এই লালমাটি এলাকার মধ্যেই পড়ে। এদেশের সবচেয়ে প্রাচীন লালমাটি এলাকাগুলোর ভূতাত্ত্বিক শ্রেণি হলো দশ লক্ষ থেকে সাড়ে সাত কোটি বছর আগেকার টারশিয়ারি যুগে সৃষ্ট শিলা। ওই যুগে পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব ঘটেনি।

বাংলা অঞ্চলে মানুষের বসতি সবচেয়ে আগে গড়ে উঠেছিল লালমাটি এলাকাতেই। ওসব এলাকার মাটি যেমন এদেশের মধ্যে প্রাচীনতম, তেমনি মানব বসতিও প্রাচীনতম। আর বাংলায় মানুষ যখন থেকে বসবাস করতে শুরু করেছিল, তখনো সভ্যতার আলো ছড়ায়নি। সে হলো প্রস্তরযুগের কথা। পাথর বা ফসিল–কাঠ (জীবাশ্ম–কাঠ) দিয়ে সেকালের মানুষের তৈরি হাতিয়ার বাংলা এলাকায় বেশ কিছু জায়গায় পাওয়া গেছে। পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া এলাকা থেকে বিপুল সংখ্যক পাথরের হাতিয়ার পাওয়া গেছে। এগুলো প্রাচীন, মধ্য, শেষ, পুরাতন পাথরের যুগ ও নতুন পাথরের যুগের মানুষ ব্যবহার করত। যেমন, বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া পাহাড় এলাকায় ছড়িয়ে থাকা পাথর দিয়ে প্রস্তরযুগের মানুষরা এসব হাতিয়ার বানিয়ে আশপাশের বনের হিংস্র পশু শিকার করত। পশ্চিমবঙ্গের আরো একাধিক এলাকায় প্রস্তরযুগের মানুষের তৈরি হাতিয়ার পাওয়া গেছে।

বাংলাদেশেও অনেকগুলো জায়গা থেকে প্রস্তরযুগের মানুষদের ব্যবহার করা হাতিয়ার পাওয়া গেছে। এর মধ্যে আছে কুমিল্লা জেলার লালমাই পাহাড়ি এলাকা, চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড পাহাড়ি এলাকা, রাঙামাটি, ফেনী

জেলার ছাগলনাইয়া, নরসিংদী জেলার উয়ারি-বটেশ্বর ও হবিগঞ্জ জেলার চাকলাপুঞ্জি চা-বাগান এলাকা। প্রস্তরযুগের হাতিয়ার প্রাপ্তির এলাকাতে সেগুলোর ব্যবহারকারীরা বসবাস করে থাকতে পারে অথবা অন্য কোনো জায়গা থেকেও সেগুলো কোনো কারণে ওসব জায়গায় এসে থাকতে পারে। তবে আদিম শিকারি মানুষেরা প্রস্তরযুগে যে ওসব হাতিয়ার ব্যবহার করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। তার মানে ওই হাতিয়ারগুলো আমরা যখন দেখি, তখন আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে প্রস্তরযুগের ছবি।

আসলে একেবারে আদিম অবস্থায় মানুষ আশ্রয় নিয়েছিল উঁচু বা পাহাড়ি এলাকায়। তারা তখনো জানত না সভ্যতা কী জিনিস। যেহেতু মানুষ চাষবাস শেখার পরেই সভ্য হয়েছে, তাই সেই আদিম মানুষেরা চাষবাস অর্থাৎ কৃষিকাজ জানত না। যদি তারা চাষ করে ফসল ফলাতে জানত, তাহলে তাদের সারা বছরের খাবারের ব্যবস্থা থাকত। কিন্তু প্রতিনিয়ত তাদের মাথায় ঘুরত খাবারের চিন্তা। তাই তাদের প্রধান কাজ ও চিন্তা ছিল শিকার। বুনো ফলমূল ও শিকার করা পশুপাখির মাংস না খেলে যে তাদেরকে প্রাণে মারা পড়তে হতো! তাই প্রাণ বাঁচানোর জন্যেই তাদেরকে শিকার করতে হতো। আর শিকার করার জন্যে তাদেরকে হাতিয়ার বানাতে হতো।

বাংলাদেশের আবিষ্কৃত প্রস্তরযুগের হাতিয়ারের মধ্যে যেমন পাথরের তৈরি হাতিয়ার আছে, তেমনি আছে ফসিলে পরিণত কাঠে তৈরি হাতিয়ার। তাই বলে এগুলোকে কিন্তু কাঠের তৈরি হাতিয়ার বলা যাবে না কিছুতেই। যদিও এককালে ওগুলো কাঠ ছিল, তবে কালক্রমে পাথরে পরিণত হয়েছে তা। হাতিয়ারগুলো ছিল হরেকরকমের এবং বিভিন্ন সময়ের। ঢাকার শাহবাগের জাতীয় জাদুঘরে এবং শেরেবাংলা নগরের সামরিক জাদুঘরে বাংলাদেশে প্রাপ্ত প্রস্তরযুগের হাতিয়ার রয়েছে। বাংলাদেশে হাতকুঠার, ফ্লেক, ব্লেড প্রভৃতি নানান ধরনের প্রস্তরযুগীয় হাতিয়ার পাওয়া গেছে। বাংলাদেশের উত্তরে আসাম, দক্ষিণ-পূর্বে মায়ানমার এবং পশ্চিমে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার প্রভৃতি এলাকায় পাওয়া গেছে প্রস্তরযুগের হাতিয়ার।

প্রস্তরযুগের পরে মানুষ কৃষিকাজ শেখে এবং কৃষিভিত্তিক সভ্যতা গড়ে তোলে। খ্রিস্টপূর্বকালের অর্থাৎ আজ থেকে দুই হাজার বছরেরও বেশি আগের মানুষের ব্যবহার করা জিনিসপত্র এবং মানুষের গড়ে তোলা শহরের ধ্বংসাবশেষও আবিষ্কৃত হয়েছে। নরসিংদীর বেলাবো উপজেলার উয়ারি-বটেশ্বর, বগুড়ার মহাস্থান গড়, জয়পুরহাটের পাথরঘাটা, মাগুরার টিলা গ্রাম প্রভৃতি জায়গায় খুব প্রাচীন মানব বসতির প্রমাণ মিলেছে। মানুষের ব্যবহার করা হরেকরকমের জিনিসও পাওয়া গেছে। গোপালগঞ্জ জেলার কোটালিপাড়া, নওগাঁ জেলার মাহীসন্তোষ, যশোর জেলার ভরতভায়না, ঠাকুরগাঁ জেলার নেকমরদ, পঞ্চগড় জেলার ভিতরগড়, ঢাকা জেলার সাভার, সিরাজগঞ্জ জেলার নিমগাছি, রাজশাহী জেলার নওগাঁ ও বিহারৈল, মুন্সিগঞ্জ জেলার প্রাচীন বিক্রমপুর নগরী এলাকায় দিনাজপুরের ঘোড়াঘাট, কুমিল্লার লালমাই-ময়নামতি, ফেনীর শিলুয়া প্রভৃতি জায়গায়ও অনেক প্রাচীনকালের জিনিসপত্র বা দালানকোঠা পাওয়া গেছে।

বাংলাদেশের সভ্যতা যে কত প্রাচীন তারই প্রমাণ এসব প্রাচীন নিদর্শন। এসব পুরনো দিনের কীর্তিকে বলে পুরাকীর্তি। আর পুরাকীর্তি দেখে আমরা বাংলাদেশের অতীত ইতিহাসকে জানতে পারি। আসলে ইতিহাসের পাতায় যেসব কথা লেখা থাকে সেগুলো সত্যি না মিথ্যা তা বোঝা যায় পুরাকীর্তি দেখে। তাছাড়া লেখা শেখার আগেকার মানুষ যখন নিজেদের ইতিহাস লিখে যেতে পারেনি, তখনকার মানুষের কথা আমরা জানতে পারি তাদের ব্যবহার করা জিনিসপত্র, তাদের হাড়গোড় বা ফসিল দেখে। পুরাকীর্তি আমাদেরকে হারিয়ে যাওয়া দিনের গল্প শোনায়, দূর অতীতকে সামনে টেনে আনে। কাজেই বাংলাদেশের ইতিহাস জানতে হলে চিনতে হবে এদেশের পুরাকীর্তিগুলোকে।

ঈদ গল্প-৪

খাজুর সন্ন্যাসী

মুস্তাফা মাসুদ

খাজুর সন্ন্যাসী নাম শুনেই খটকা লাগে আতিকের। এটা আবার কী? এমন নাম তো কখনো শুনিনি? এ আবার কোনো ধরনের সন্ন্যাসী? আতিক জানতে চায় তার মামাতো ভাই সাফিনের কাছে। সাফিনই আতিককে ফোনে জানিয়েছে– চৈত্র মাসের শেষদিন চৈত্রসংক্রান্তিতে পাশের গাঁয়ে মেলা শুরু হয়। সেই মেলা পহেলা বৈশাখ পেরিয়ে আরো সাতদিন চলে। সে উপলক্ষেই খাজুর সন্ন্যাসী এক আজব খেলা দেখায় খেজুর গাছের মাথায় উঠে। সবটা এখন বলব না। আয়, নিজের চোখেই সব দেখতে পাবি।

এক দারুণ রহস্য রেখেই সাফিন ফোন রেখে দিয়েছিল। এ কারণেই আতিকের কৌতূহল তাকে পাগল করে দিচ্ছে। তর সইছে না যেন। আগামীকাল নাইট কোচের টিকেট পেয়েছে। দু'দিন পর মেলা শুরু। বেশ সময় আছে। কোনো অসুবিধে হবে না।

যথাসময়ে মামাবাড়িতে পৌঁছে যায় আতিক। গোসলের পর খেয়ে দেয়ে এক লম্বা ঘুম। ঘুম ভাঙতে ভাঙতে শেষ বিকেল। ঘুম থেকে উঠেই আতিক চেপে ধরে সাফিনকে– খাজুর সন্ন্যাসী সম্পর্কে বল না দোস্ত।

সাফিন বলে–একটু ধৈর্য ধর। কালই সব দেখতে পাবি। আমরা তো প্রতি বছর দেখি, তাই খুব বেশি উতলা হই না। কিন্তু প্রতি বছরই নতুনভাবে রহস্যের মাঝে হাবুডুবু খাই সন্ন্যাসীর খেলা দেখে। আনন্দও পাই। এবার নাকি এক ছোকরা সন্ন্যাসী খেলা দেখাবে। তাই আগ্রহ আমাদেরও কম না।

কী আর করা! কাল বিকেল পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হচ্ছে। তাই সাফিনকে নিয়ে সে ঢেপাই বিলের দিকে যায় হাওয়া খেতে। বিলের ফুরফুরে হাওয়ায় ভারি ভালো লাগে হাঁটতে।

ছোট্ট একটা খাল পেরোলেই সেই গ্রামটি, যেখানে মেলা বসে। আতিক আর সাফিন পরদিন মেলায় পৌঁছে যায় দুপুরের পরপরই। ঘুরে ঘুরে দেখে মেলার বিভিন্ন জিনিসপত্র। তারপর এক সময় পৌঁছে যায় মেলার উত্তর-পশ্চিম কোনায়। সেখানে বড়োসড়ো একটা খেজুর গাছ। লম্বায় ত্রিশ ফুটের কম না। গাছের মাথায় বড়ো বড়ো ডাল। গাঁয়ের মানুষেরা যাকে বলে ডা'গো, চোখা চোখা কাঁটায় ভরা। গাছের গোড়া থেকে ওপরের দিকে অনেকটা জায়গা লাল রং দিয়ে রাঙানো। আতিককে দেখিয়ে সাফিন বলে– এই দেখ সেই খাজুর গাছ, মানে খেজুর গাছ। এটাতেই হবে সেই তাজ্জব খেলা, যা দেখার জন্য তুই এত কষ্ট করে ঢাকা থেকে এখানে ছুটে এসেছিস। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই তা দেখতে পাবি। ডোন্ট ওরি, দোস্ত।

সময় গড়াতে থাকে। আতিকের কাছে মনে হয়, সে যেন কত-কত বছর ধরে অপেক্ষা করছে এক আজব খেলা দেখার জন্য। কিন্তু না। আর অপেক্ষা নয়। সতেরো-আঠারো বছরের এক তরুণ এসে দাঁড়ায় খেজুর গাছের গোড়ায়। তার পরনে হাঁটু পর্যন্ত গোটানো একটা জিনসের প্যান্ট আর সবুজ স্যান্ডো গেঞ্জি। খালি হাত। খালি পা। মাথায় একটা লাল গামছা প্যাঁচিয়ে বাঁধা। হ্যাংলা-পাতলা চেহারা।

সে এসেই খেজুর গাছকে প্রণাম করে দু'হাত বুকের কাছে জড়ো করে। তারপর গাছের ওপরের দিকে তাকিয়ে খানিকক্ষণ বিড়বিড় করে কী যেন আওড়ায়– মন্ত্র পড়ছে কী! সাফিন আতিককে ইশারা করে, এই দেখ সন্ন্যাসী। ছোকরা খাজুর সন্ন্যাসী। এবারই প্রথম শুরু করল খেলা। ছেলেটি আর এক মুহূর্ত দেরি করে না। কাঠবিড়ালির মতো তরতর করে উঠে যায় গাছের মাথায়, সেই তীক্ষ্ণ কাঁটার জঙ্গলে। সেখান থেকে সে নিচের দিকে তাকায়। গর্বিত সে দৃষ্টি, কিন্তু মুখ গম্ভীর। কোনো কথা বলল না। সে ফের মুখ ঘুরিয়ে খেজুরের চোখা চোখা বড়ো বড়ো কাঁটাগুলোর ওপর এলোমেলো হাত বোলায়– যেন আদর করছে সুচালো কাঁটাগুলোকে। এরপরই শুরু হয় তার খেলা।

নিচে শত শত মানুষের ভিড়। খেলা দেখতে এসেছে। এবারের সন্ন্যাসী নতুন আর অল্প বয়েসি বলে সবার কৌতূহলও অনেক বেশি। তারা সবাই তাকিয়ে রয়েছে গাছের ওপরের দিকে। কেউ একটা শব্দও করছে না।

খাজুর সন্ন্যাসী হঠাৎ একটা ডা'গো ধরে গাছের মাথা বরাবর চারদিকে একটা চক্কর দেয় পাখির মতো ডানা মেলে উড়াল দেওয়ার ভঙ্গিতে। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়ায় গাছের মাথায়। সবগুলো ডা'গোর গোড়ার দিকের খানিকটা জুড়ে বড়ো বড়ো চোখা চোখা কাঁটা। ছেলেটি সেই কাঁটাগুচ্ছের ওপর পা রাখে এবং মুহূর্তেই যেন শুরু হয়ে যায় তাণ্ডব-নৃত্য। সে একটি ডা'গো ছেড়ে আরেকটি ধরে। আরেকটি... আরেকটি... এভাবে খেজুর গাছের মাথাজুড়ে সবদিকে ঘোরে চর্কির মতো। একবার..দুইবার..তিনবার...এত তাড়াতাড়ি এই ঘোরার কাজটি হচ্ছে যে, ঠিকমতো ঠাহরই করা গেল না যে, কবার সে চক্কর দিয়েছে– দশবার? বিশবার? একশবার? পায়ের নিচের চোখা চোখা কাঁটাগুলোকে সে কী স্বচ্ছন্দে মাড়িয়ে যাচ্ছে! তার ঘোরার মধ্যে কী চমৎকার তাল! তাতে নাচের ছন্দ আছে। বীরের দাপট আছে। সবাই রুদ্ধশ্বাসে দেখছে তার এই কাণ্ড। দেখতে দেখতে খেজুরের লালচে চোখা কাঁটাগুলো অসহায়ের মতো নুয়ে পড়ে ছেলেটির পায়ের নিচে। ডা'গোগুলোও নেতিয়ে পড়ে নিচের দিকে; যেন বিশাল এক যুদ্ধে পরাজিত সৈন্যরা মুখ থুবড়ে পড়ে আছে এক কিশোর বীরের পদতলে!

ছেলেটি আর এক মুহূর্ত দেরি করে না। তাড়াতাড়ি নেমে আসে নিচে। সে দিব্যি সুস্থ। তার পা-হাত বা অন্য কোথাও কাঁটার একটা আঁচড় পর্যন্ত লাগেনি! সবাই আনন্দে হাততালি দেয়। কয়েকটা তরুণ ছেলে তাকে কাঁধে উঠিয়ে থ্রি-চিয়ার্স দেয়। গাঁয়ের মেম্বার তাকে পুরস্কার দিল পাঁচ হাজার টাকা। উপস্থিত লোকজন কেউ দশ-বিশ-পঞ্চাশ, কেউ একশত-দুশত টাকা দেয়। আতিক গোটা পাঁচশ টাকার একটা নোট দিয়ে দেয় ছেলেটির হাতে। তারপর বলে– দাদা, খুব ভালো লেগেছে আপনার খেলা– বলতে গেলে, এ যেন এক চমৎকার জাদু। আমি আপনার সাথে দু-একটা কথা বলতে চাই। শুধু এই খেলা দেখার জন্যই আমি ঢাকা থেকে এসেছি।

ওরা খেজুর গাছের উত্তর দিকে সবুজ ঘাসের ওপর বসে। খেলা শেষ হওয়ায় এখানকার লোকজনও চলে যায় মেলায়। জায়গাটা এখন বেশ নিরিবিলি। আতিক সরাসরি প্রশ্ন করে খাজুর সন্ন্যাসীকে– ঘটনাটা কী, বলুন তো দাদা? এত বড়ো বড়ো সুচালো কাঁটাগুলো আপনি খালি পায়ে মাড়িয়ে গেলেন– বলা যায় দলাইমলাই করে ছাড়লেন আর আপনার কিছুই হলো না! একটা কাঁটা পর্যন্ত বিঁধল না আপনার পায়ে! রহস্য কী? নিশ্চয়ই কঠিন কোনো তন্ত্র-মন্ত্রের শক্তি আছে ?

কোনো তন্ত্র-মন্ত্র নেই। আমিও তোমাদের মতো জেনারেল লাইনে পড়ি। এইচএসসি সেকেন্ড ইয়ারে। তবে গাছে ওঠার আগে মন্ত্র পড়ার ভঙ্গি করছিলাম কেন জানো? সাধারণ মানুষ যাতে ভাবে– বাপ-দাদা-ঠাকুরদার মতো আমিও বিরাট কোনো শক্তির অধিকারী, তাই ও-রকম মন্ত্র পড়ার অভিনয় করেছিলাম; নাথিং এল্‌স! এটা অবশ্যই এক ধরনের প্রতারণা; কিন্তু মানুষের এত কালের বিশ্বাস আর ঐতিহ্যের শেকড় নষ্ট করার অধিকার তো আমার নেই...

স্ট্রেঞ্জ!

হ্যাঁ ভাইয়া, আমার নাম অমল শিকদার। আমি বিজ্ঞানের ছাত্র। এই খেলা আমাদের পারিবারিক এবং ধর্মীয় ঐতিহ্য। এত কাল আমার বাবা খেলতেন। তার বয়স হয়েছে। এবার থেকে আমার শুরু। বাবার কাছ থেকেই আমি শিখেছি। সাধারণ মানুষ অবশ্য একে অলৌকিক কাণ্ড বলে মনে করে; কিন্তু এখন আমি জানি– তা ঠিক নয়; এখানে রয়েছে বিজ্ঞানের সূত্র।

বিজ্ঞান!! কী বলছেন আপনি! বিজ্ঞানের কোনো সূত্র খেজুরের কাঁটাকে বশ করতে পারে বলে জানা যায়নি এখনো। –আতিক যুক্তি দেখায়।

অমল বলে– সরাসরি বিজ্ঞান না বলতে চাও, কল্পবিজ্ঞানই মনে করো। আর সেই কল্পবিজ্ঞান পিওর বিজ্ঞান হিসেবে ধরা দিয়েছে আমার কাছে। কিন্তু একথা কাউকে বলা যাবে না। বললে মানুষের এত কালের ভক্তি আর বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যাবে।

আতিকের কৌতূহল আরো গাঢ় হয়। জটিল এক ধাঁধার মধ্যে পড়ে যায় যেন সে। সাফিনও। কিছুক্ষণ কোনো কথা জোগায় না ওদের মুখে। অমলই নীরবতা ভাঙে– ধাঁধায় পড়ে গেছ, তাই তো ? শোনো, এখানে জাদু বা তন্ত্র-মন্ত্রের কোনো কারসাজি নেই। এখানে কাজ করেছে শুধু মনের জোরালো ইচ্ছেশক্তি আর আত্মবিশ্বাস। সেটা সবাই আয়ত্ত করতে পারে না, কেউ কেউ পারে। এছাড়া কাঁটার মধ্যে পা চালানোরও একটা কৌশল আছে। সেটাও সবাই আয়ত্ত করতে পারে না, এজন্য অনেক প্রাকটিস করতে হয়– আমিও তা করেছি। এই ইচ্ছেশক্তি, আত্মবিশ্বাস আর কাঁটার জঙ্গলে নিখুঁতভাবে পা চালানোর কৌশল আমার ঠাকুরদার বাবা প্রথম আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন, তার কাছ থেকে ঠাকুরদা, তার কাছ থেকে আমার বাবা শিখেছিলেন। তারা অবশ্য এটাকে অলৌকিক ব্যাপার বলেই বিশ্বাস করতেন। মজার ব্যাপার হলো, তারা খেলা শুরুর আগে নাকি এক ধরনের ঘোর লাগা অবস্থায় খানিকটা অস্বাভাবিক হয়ে পড়তেন; খেলা শেষ হওয়ার পরও আধাঘণ্টা মতো সেভাবেই থাকতেন। আমার বাবার কাছ থেকে খেলাটা শিখে আমিও প্রথমে একে অলৌকিক কাণ্ড বলেই মনে করতাম; কিন্তু তা উলটে গেল একটা ব্যাপারে...

কী ব্যাপারে? একসঙ্গে প্রশ্ন করে সাফিন আর আতিক।

অমল বলে, আমি তখন কেবল এইচএসসি ফার্স্ট ইয়ারের মাঝামাঝি। ক্লাস ওয়ান থেকে টেন পর্যন্ত সব পরীক্ষায় আমি প্রথম হয়েছি। এসএসসিতেও গোল্ডেন জিপিএ পেয়েছি। কলেজের ছাত্র-শিক্ষকেরা সবাই এখবর জানেন। তাই স্যারেরা সবাই আমাকে একটু বেশি আদর করেন। অনেক বিষয়ে আমার সাথে খোলামেলা আলাপ করেন। একদিন ইংরেজির জামান স্যার আমাকে আচমকা প্রশ্ন করেন, অমল, তুমি সায়েন্স ফিকশন গল্পের বই পড়ো? বিজ্ঞান কল্পকাহিনি?

কিছু কিছু পড়ি স্যার। পত্রিকায়ও পড়ি মাঝে মাঝে।

বিখ্যাত সায়েন্স ফিকশন রাইটার এইচ. জি. ওয়েলসের বই পড়েছ? স্যার আবার প্রশ্ন করেন। আমি বলি, *টাইম মেশিন* পড়েছি স্যার। অন্যগুলো এখনো পড়িনি। তবে মেরি শেলির ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের অনুবাদ পড়েছি স্যার।

স্যার সেদিন বিকেলে আমাকে তার বাসায় নিয়ে গেলেন। তার বইয়ের শেলফ বাংলা-ইংরেজি নানান ধরনের বইয়ে ঠাসা। সেখান থেকে ৪টি ইংরেজি বই বের করে আনলেন তিনি। টেবিলে রেখে বললেন, এই দেখো বিদেশি সায়েন্স ফিকশন গল্পের বই।

আমি মুহূর্তে হুমড়ি খেয়ে পড়ি বইগুলোর ওপরে। একটির লেখক আইজাক আসিমভ, অন্যটির এইচ জি ওয়েলস, তৃতীয় বইটির লেখক রে. ব্র্যাডবেরি এবং চতুর্থটির লেখক এডগার রাইস বারোজ। বইগুলো আমি বাড়িতে নিয়ে গেলাম। পড়লাম। চমৎকার ইংরেজি; পড়তে তেমন অসুবিধা হলো না। অবশ্য বারকয়েক ডিকশনারি দেখতে হলো কিছু শব্দের অর্থ উদ্ধারে। কিন্তু ভালোভাবেই বুঝতে পারলাম। তবে এর মধ্যে আমাকে সবচেয়ে চমৎকৃত করল এইচ জি ওয়েলসের একটা গল্প– যেখানে ইচ্ছেশক্তির জোরে অবিশ্বাস্য সব কাণ্ড ঘটাবার বর্ণনা আছে। সেই গল্পটিতে ফেদারিঙ্গো নামের সাধারণ চাকরিজীবী এক ব্যক্তির অবিশ্বাস্য কিছু কাণ্ড ঘটাবার কাহিনি আছে। না না, জাদুমন্ত্রের বলে নয়; অদম্য ইচ্ছেশক্তি বা উইল পাওয়ারের শক্তিতেই তিনি তা ঘটান। আমি ওই গল্পটি বারবার পড়লাম। বলা যায় গোগ্রাসে গিললাম। আর কী আশ্চর্য! আমার ভেতরটা যেন কেমন কেমন করতে লাগল– ভিন্ন ধরনের এক শক্তি ও শিহরণ অনুভব করতে লাগলাম। ছোটোখাটো দু'একটা পরীক্ষাও করলাম এবং ভালো ফলও পেলাম। তবে, আমি গোড়া থেকেই সাবধান ছিলাম; কারণ, ওয়েলসের ফেদারিঙ্গো বেপরোয়াভাবে ইচ্ছেশক্তি প্রয়োগ করতে গিয়ে যেমন আশ্চর্য ফল পেয়েছিলেন, তেমনি এর অতি ব্যবহারে শেষমেশ নিজের জীবন নিয়ে টানাটানি পড়েছিল তার। তাই কারো কোনো ক্ষতি হয়, এমন কোনো কাজে আমি এই শক্তি কাজে লাগাবো না বলে প্রতিজ্ঞা করেছি। আজকের খাজুর সন্ন্যাসীর খেলা দিয়েই বড়ো কোনো কাজে আমার ইচ্ছেশক্তির উদ্‌বোধন হলো।

এটা কী সত্যিই সম্ভব... আতিক আমতা আমতা করে।

সম্ভব যে, তা তো তোমরা নিজের চোখেই দেখলে। শত শত মানুষ দেখল। দেখো ছোটো ভাইরা, পশ্চিমা দেশে এই ইচ্ছেশক্তির বিষয় নিয়ে অনেক আগেই কল্পবিজ্ঞানের গল্প বা সায়েন্স ফিকশন লেখা হয়েছে; কিন্তু কেউ তার বাস্তব প্রমাণ দেখাতে পারেনি। আমরা– এই অজ পাড়াগাঁয়ের গরিব শিকদার পরিবারের চার প্রজন্মের চারজন মানুষ সেই কল্পনাকে বাস্তবে দেখাতে পেরেছি। অবশ্য আমার আগের তিন প্রজন্মের মানুষেরা জানতেও পারলেন না বিজ্ঞানের এই অসাধারণ অজানা শক্তির কথা!

অমলের জোরালো যুক্তি আর বক্তব্যের ধাক্কায় চুপসে যায় আতিক। সাফিনও। ওরা আর কথা বাড়াতে সাহস পায় না। খাজুর সন্ন্যাসীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বাড়ির পথ ধরে। সন্ধ্যের অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে। একটু দূরে মেলার মাঠে শুধু অসংখ্য বিজলি বাতি ঝলমল ঝলমল করে। সেদিকে যেতে ওদের ইচ্ছে করে না।

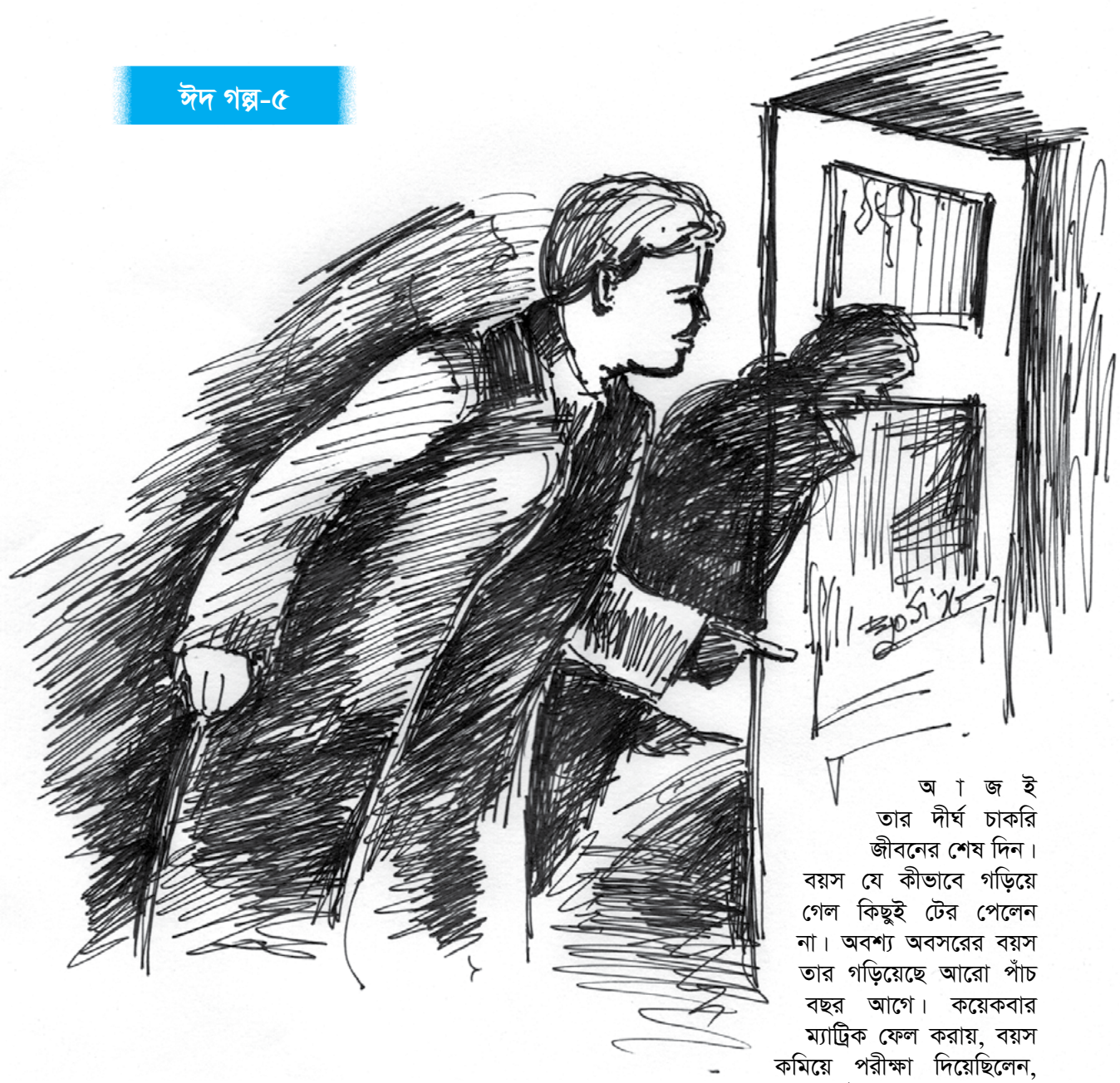

ও ব্রজনাথ

ফারুক নওয়াজ

আজই তার দীর্ঘ চাকরি জীবনের শেষ দিন। বয়স যে কীভাবে গড়িয়ে গেল কিছুই টের পেলেন না। অবশ্য অবসরের বয়স তার গড়িয়েছে আরো পাঁচ বছর আগে। কয়েকবার ম্যাট্রিক ফেল করায়, বয়স কমিয়ে পরীক্ষা দিয়েছিলেন, তাই চাকরিতে ঢুকেছিলেন আঠারো বছরের জায়গায় তেইশ বছরে। সেই হিসাবে সার্টিফিকেটের বয়স তার সাতান্ন হলেও বাস্তবে বয়স এখন বাষট্টি বছর।

বাড়ির বড়ো ছেলে বলে সংসারের দায়টা তারই বেশি। ম্যাট্রিকের রেজাল্ট বের হওয়ার তিন মাসের মধ্যেই পোস্টমাস্টারের চাকরি জুটে যায়। বদলির চাকরি।

বর্ধমানের ফুটিসাঁকো সাব-পোস্টাপিসে প্রথম। তারপর একে একে চষে বেড়িয়েছেন কান্দ্রা, শিউড়ি, আসানসোল, জঙ্গিপুর, অণ্ডাল, শক্তিগড় হয়ে বিহার-উড়িষ্যার প্রত্যন্ত এলাকায়। সবশেষে খুলনার

শিরোমণি। সাতচল্লিশে দেশভাগ হলে 'পাকিস্তান-জিন্দাবাদ' বলে বর্ধমানের প্রিয় জন্মগ্রাম খাঁজি ছেড়ে চলে এলেন খুলনায়। আর অবসর নিচ্ছেন জয়বাংলা, মানে স্বাধীন বাংলাদেশের আমলে।

প্রতিদিন এ সময় পোস্টাপিস বন্ধ হয়ে যায়। তিনিও ডাকঘরের তালাটা ঠিকমতো লাগল কিনা দেখে টুকটুক করে বাড়িমুখো হাঁটতে থাকেন। হেঁটে হেঁটে বড়ো রাস্তায় এসে বাসে চড়েন। বাসে বিশ মিনিট লাগে গ্লাক্সোর মোড়ে যেতে। সেখান থেকে একশ পা হাঁটলেই বাড়ি।

তা, আজই তার চাকরি জীবনের শেষ দিন। কাল থেকে অবসরকালীন ছুটি। শেষ দিনটি তাকে যেন আরো টেনে ধরে। সাঁঝ হয়ে আসছে তবু ওঠার নামটি নেই। একগাদা চিঠি বড়ো পোস্টাপিস থেকে এখানে এসে জমা দিয়ে গেছে ডাক বিভাগের গাড়ি।

চিঠিগুলো একেক করে ঠিকানা পড়ে পড়ে আলাদা করে রেখেছেন। হঠাৎ একটা চিঠিতে চোখ আটকে গেল। এটা তার নামে এসেছে। বাঁকানো হাতের লেখা। চোখের পাওয়ার বেড়েছে। মোটা কাচের চশমাটা নাকের কাছে এনে মাথা ঝুঁকিয়ে পড়তে থাকেন–

'প্রাপক
বন্ধুবর বজলে করিম
পোস্টমাস্টার
শিরোমণি পোস্টাপিস
জেলা-খুলনা
বাংলাদেশ।'
খামের বাঁ পাশে প্রেরকের ঠিকানা–
'শ্রী ব্রজনাথ পালিত
গ্রাম-হেমনগর
পোস্টাপিস–ধরিত্রিপুর
জেলা–বর্ধমান
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।'

খামটা পেয়ে মুহূর্তেই আনন্দে বলে ওঠেন, 'ব্রজরে আমার কথা তোর মনে আছে তাহলে!'

বেশ জোরেই বললেন কথাটা। তবে আশপাশে কেউ নেই বলে তিনি একাই শুনেছেন নিজের এই আনন্দ-উচ্ছলতার উচ্চারণ।

আর দেরি সয় না। আলগোছে খামটা খুলে চিঠিটা বের করেন। সবুজ কাগজে আঁকাবাঁকা কালো লেখা।

'ব্রজ, তোর হাতের লেখাটা কিন্তু তেমনই আছে।' মনে মনে বলে চিঠিটা পড়তে থাকেন।

'প্রিয় বন্ধু বজু,

এই চিঠি পেয়ে হয়ত চমকে উঠবি। আমাকে তোর মনে আছে রে! হিসাব কষে দেখেছিস– কতদিন তোর সাথে দেখা নেই? ৪৮ থেকে ৭৩। মানে, রীতিমতো পঁচিশ বছর। বোধ হয় তুই বুড়িয়ে গেছিস। আর আমিও তো জীবন সায়াহ্নে। তা শেষজীবনে তোকে একটিবার দেখার খুব সাধ হলো রে। তাই চিঠিটা লিখলাম। তোর ঠিকানা নিয়েছি আনখোনার বিজু মুখুজ্যের কাছ থেকে। তা কেমন আছিস? তোর চাকরি তো এতদিনে শেষের পথে। তা এখনই সময় একবার আমার গাঁয়ে বেড়িয়ে যাওয়ার।

আয়নারে ভাই, তোকে একটু দেখি। দুটো কথা বলে মনটাকে হালকা করি।

আমার এখানে আসার পথ এখন খুব সোজা।

হাওড়া থেকে ২২১ বর্ধমান লোকালে চড়ে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে পৌঁছে যাবি কাটোয়া। কাটোয়া নেমে সোজা ৫৪নং বাসে চড়ে ধরিত্রিপুর। ওখান থেকে হেঁটে দেড় কিলোমিটার উত্তরেই হেমনগর। কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করতে হবে না। হেমনগর বাজার থেকে বায়ের খোয়া বিছানো ছোটো রাস্তাটা ধরে গুণে গুণে একশ উনিশ পা হাঁটবি। এরপর ডান দিকের চিকন মেঠো পথটা ধরে আরো শ'খানিক পা গেলে, ডান দিকে একটা খামারবাড়ি। দোচালা টিনের একটা ঘর দেখবি। ঘরের সামনে এক চিলতে উঠোন। উঠোনে একটা পুরনো নিমগাছ। বাড়িটা কেমন ফাঁকা-ফাঁকা মনে হবে। সেখানে আমি একাই থাকি। ছেলেরা থাকে আধা কিলোমিটার উত্তরে নতুন বাড়িতে।

উঠোনে এসে হাঁক দিলেই আমি দরজা খুলে দেবো। একটিবার আয় ভাই, এলে আমার জীবন ধন্য হবে। তোর বউ বেঁচে আছে? ছেলে-মেয়েরা কী করে? সবাইকে আমার আশীর্বাদ দিস।

ইতি তোর বন্ধু

ব্রজনাথ।
২৯শে শ্রাবণ, ১৩৮০।'

বেশ কবার চিঠিটা আদ্যোপান্ত পড়ে বুক-পকেটে রাখলেন। না, আর মন টিকছে না জীবনের শেষ দিনটায়। প্রিয় এই কর্মক্ষেত্র এতদিন তাকে মায়াডোরে জড়িয়ে রেখেছিল; কিন্তু বন্ধুর চিঠিটা পড়ার পর এখন বাড়ি তাকে টানছে।

চটপট নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে ডাকঘরের দরজায় তালাটা লাগিয়ে হাঁটা ধরেন।

বাড়িতে ফিরে স্ত্রী, ছোটো মেয়ে, মেজো ছেলে– সবাইকে ডাকলেন। এরপর আরো বার দুয়েক সবাইকে চিঠিটা পড়ে শোনালেন।

মনটা তার সেই তারুণ্যে ফিরে যায়। মেয়েকে বললেন, 'বুঝলিরে পুতুল, এই ব্রজ হচ্ছে আমার শৈশবের বন্ধু। চাকরিতে ঢোকে হাই স্কুলে। মাধবপুর ইংরেজি স্কুলের হেডমাস্টার পর্যন্ত হয়েছিল। সেই যে ৪৮ সালে চলে এলাম। তারপর আর দেখাসাক্ষাৎ–চিঠিপত্র কিছুই হয়নি। দেখরে মা, বন্ধুত্বের বাঁধন। এজন্য চাকরি জীবনের শেষ দিনে এ চিঠিটা পেলাম। তা আমি কালই পাসপোর্ট করতে দেবো। আরতো কাজের টান নেই। মন ভরে বেড়ানো যাবে এবার। প্রথম যাত্রাই হবে ব্রজের ঠিকানা। কী বলিস মা, তোর মতটা কী বলতো!'

'যাও বাবা, একবার দেখেই আসো। আর তোমার জন্মগ্রামটাও ঘুরে এসো। সম্ভব হলে আমরাও না হয় পরে একবার বেড়িয়ে আসব।'

'ঠিক বলেছিস, আসলে ওর চিঠিটা পেলাম বলেই জন্মগ্রাম, বাবার ভিটেটার চেহারাটাও দেখা হবে।'

চিঠিতে বন্ধুর নির্দেশনা মতোই এসে পৌঁছলেন হেমনগর। সেই হেমনগর আর এই হেমনগরে বিস্তর ফারাক। আগে নদী-কাদা, ঝোপজঙ্গল ঠেলে কটোয়া থেকে দশ ঘণ্টার পথ ছিল। এখন রীতিমতো শহর। কী সহজ, মুহূর্তের পথ।

বন্ধুর চিঠির নির্দেশনা মতো হেমনগর বাজার থেকে বাঁয়ের খোয়ার রাস্তায় গুণে গুণে একশ উনিশ পা হাঁটলেন। এরপর ডান দিকে কাঁচা ছোট্ট রাস্তা ধরে ঠিক একশ পা। চোখে পড়ল সেই ফাঁকা মতো নিমগাছঅলা দোচালা টিনের ঘর। শেষ বিকেলের সূর্যের মায়াবি আভা। সাঁঝ হবো হবো করছে। কেমন খাঁ খাঁ আতঙ্ক চারদিকে। কোনো মানুষজন নেই।

বজলে করিম এগিয়ে গেলেন ঘরটার কাছে। হাতে তার একটা কালো ব্যাগ। এর মধ্যে দু'চারটা পরনের কাপড়, আর বন্ধুর জন্য একটা ধুতি আর পাঞ্জাবি। এক প্যাকেট সাতীরার নলেন গুড়ের সন্দেশও এনেছেন।

না, বন্ধুর নাম ধরে ডাকতে হলো না। আবছে দরজা খুলে গেল। ভেতর থেকে কণ্ঠ ভেসে এল– 'আয় বজু, আয় ভাই। আমি জানি তুই আজই আসবি।'

বজলে করিম ঘরের ভেতর ঢুকে গেলেন। ঘরটা কেমন অন্ধকার! এক কোণে টিমটিম করে একটা হারিকেন জ্বলছে। অন্ধকারে বন্ধু-ব্রজনাথকে দেখতে পাচ্ছেন না।

'তা ব্রজ তুই কোথায়?'

বজলে করিমের ডাকে ব্রজ সাড়া দেন, 'এই তো আমি'।

ঘরের দক্ষিণ কোণে একটা চৌকি। সেখানে ব্রজ শুয়ে। পা-মুখ ঢাকা। একটা সাদা রঙের কাঁথায়। বন্ধুর কাছে এগিয়ে যেতেই হারিকেনটা দপ করে একবার জ্বলেই নিভে গেল।

'অন্ধকারে আসিস না। তুই ওপাশের চৌকিতে একটু বিশ্রাম নিয়ে নে।'

ব্রজের কথামতোই অন্য খালি চৌকিটায় শুয়ে পড়লেন বজলে করিম। শুয়ে শুয়েই দুপাশ থেকে দু'জনের কথা চলতে থাকে। এক কোণে টিমটিম করে একটা হারিকেন জ্বলছে...

'তুই এসেছিস, খুব খুশি হলাম রে!'

'তা এখানে তুই একা?'

'একাই। ছেলেরা থাকে নতুন বাড়িতে। আর তোর বউদি তো কবেই মরে ভূত!'

'এখানে, খাওয়াদাওয়া কীভাবে করিস?'

'ওটার কোনো সমস্যা নেই। তুই একটু জিরিয়ে নে, তারপর খাবার চলে আসবে। খেয়ে নিস, আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে। তুই খেয়ে ঘুমোস। সকালে মন খুলে কথা হবে।'

বজলে করিমের কেমন একটা ভয় ভয় করতে থাকে। মনে মনে ভাবেন– 'আশ্চর্য, ব্রজ চিঠি লিখল কত আবেগ মিশিয়ে। কত আন্তরিকতা তাতে। আর আসা অবধি তার মধ্যে কেমন একটা ঢিলেমি ভাব। সে অসুস্থ বুঝলাম, কিন্তু পঁচিশ বছর পর এলাম অথচ সে-রকমভাবে আমাকে গ্রহণও করল না সে। ব্যাপারটা কেমন এলোমেলো মনে হচ্ছে। একটা ভূতুড়ে মার্কা ঘরে সে একা একা... এই অন্ধকারে...!'

এমন ভাবতে ভাবতে চোখে ঘুম এসে গেল বজলে করিমের। এক সময় ঘুমিয়েও গেলেন। কতক্ষণ ঘুমিয়েছেন মনে নেই। হঠাৎ ধপ করে একটা শব্দ

হলো পায়ের কাছে। চোখ খুলে দেখেন একটা কালো বিড়াল। হারিকেনটাকে যেন আগের মতোই কে মিটমিট করে জ্বালিয়ে দিয়েছে। পাশ ফিরে দেখেন চৌকির সাথে লাগোয়া একটা টি-টেবিল। টেবিলটা আগে দেখা যায়নি। টেবিলে প্লেটে ভাত সাজানো। ঢাকনি দিয়ে ঢাকা। বড্ড খিদে পেয়েছে। সেই ভোর বেলা বেরিয়েছেন। পথে শুকনো এটা ওটা কিনে খেয়েছেন। তাতে কী খিদে যায়।

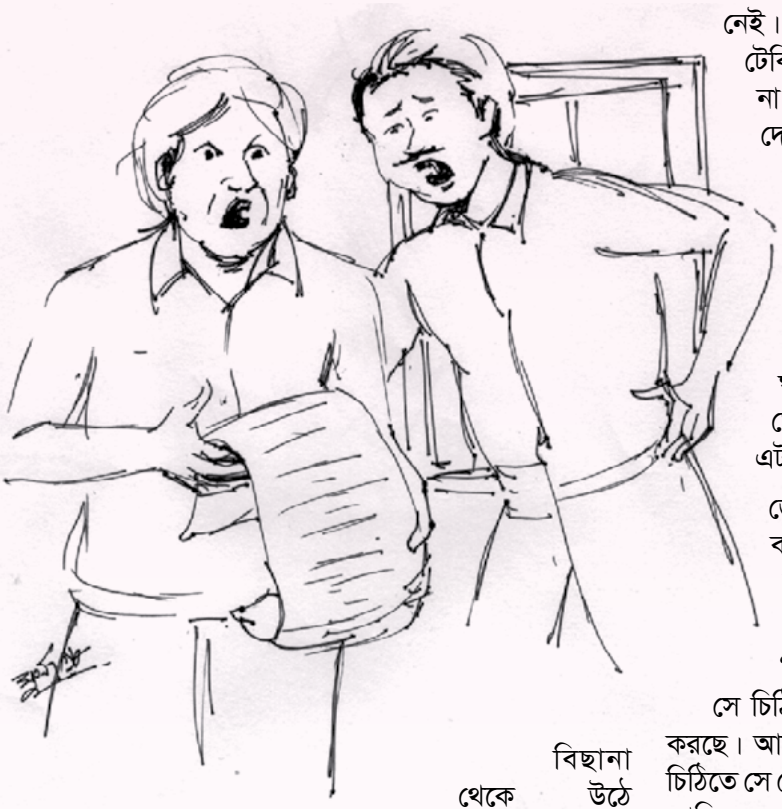

বিছানা থেকে উঠে বসেন। এ কী, জামাকাপড়ও বদলানো হয়নি! পায়জামাটা ছেড়ে লুঙ্গিটা পরে নেবেন ভাবলেন। না, ইচ্ছে হলো না। এখন খাওয়াটা আগে। ইচ্ছে হলো বন্ধু ব্রজকে ডাকবেন। না, তাও ডাকলেন না। নিজেই খেতে বসলেন।

ঢাকনি সরিয়ে দেখেন, এক বাটি করলা। মাছ-মাংস নেই। ডাল আছে এক বাটি। একটা বাসনে অল্প কিছু ভাত। হাত ধুলেন কোনোরকমে গ্লাসের পানি দিয়ে। ধোয়া ঠিক না, মোছার মতো করে একটু পানি নিয়ে হাতটা ঝেড়ে নিলেন। এরপর গোগ্রাসে ডাল আর করলা ভাজা দিয়ে দ্রুত সাবড়ে দিলেন। খেয়ে এক ঢোকে গ্লাসের পানিটা শেষ করে পা থেকে মাথা পর্যন্ত কাঁথা মুড়ে শুয়ে পড়লেন।

বাইরে লোকজনের উঁচুস্বরের কথাবার্তায় ঘুম ভাঙে বজলে করিমের। কাঁথা সরিয়ে বিছানায় উঠে বসেন। ভোরের রোদ ঘরে এসে পড়েছে। চোখ কচলে ঘরটার চারপাশে দেখতে থাকেন। একী– ওপাশে যে একটা চৌকি ছিল! সেখানে ব্রজনাথ শুয়ে ছিল। তা চৌকিও নেই, ব্রজও নেই। আর হারিকেনটাও নেই। রাতে তিনি ভাত খেলেন, সেই ভাতের টেবিল, থালাবাটি সেগুলোও তো দেখা যাচ্ছে না। এদিকে ভেতর থেকেই দরজার ছিটকিনি দেওয়া, অথচ ঘরে তিনি ছাড়া আর কেউই নেই! ভেতরে একরাশ বিস্ময় নিয়েই জোরে হাঁক দেন–

'ব্রজ...! তুমি কোথায় গেলে!'

তার ডাকের রেশ না ফুরাতেই বাইরে থেকে দরজায় টোকা পড়ল, 'ঘরে কে? এ ঘরে মানুষ ঢুকল কীভাবে? বাইরে থেকে তো তালাটা ঠিকই দেওয়া আছে। তাহলে এটা হলো কী করে?'

জোরে জোরে দরজায় টোকা পড়তেই বজলে করিম দরজার ছিটকিনি খুলে দিলেন। মাঝবয়সি একজন তাকে দেখে আঁতকে ওঠে।

'বাবা আমি হচ্ছি ব্রজের ছোটোবেলার বন্ধু। সে চিঠি লিখেছিল– আমাকে তার দেখতে ইচ্ছে করছে। আমি সেই বাংলাদেশ থেকে ছুটে আসলাম। চিঠিতে সে যেভাবে পথের নির্দেশনা দিয়েছিল সেভাবেই আসি। এসে ঘরের বাইরে দাঁড়াতেই কাল সাঁঝবেলায় সে দরজা খুলে দেয়। রাতে তার সাথে দু'চারটা কথাও হয়। হারিকেন নিভে যাওয়ায় আর কথা তেমন হয়নি। তার কথামতো শুয়ে পড়ি, সকালে কথা হবে ভেবে। রাতে সে খাবারেরও ব্যবস্থা করেছিল। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে খিদে লাগায় চৌকির পাশে ছোট্ট টেবিলে রাখা ভাত, ডাল, করলাভাজা খেয়ে নিই। এরপর ঘুম ভেঙে দেখি সকাল হয়ে গেছে। জেগে দেখি ভেতর থেকে ছিটকিনি দেওয়া– অথচ ব্রজকেও দেখছি না, সে যে চৌকিতে ঘুমিয়ে ছিল সেটাও নেই দেখছি।'

লোকটা বজলে করিমের কথাগুলো অবাক হয়ে শুনল।

শুনে কিছুক্ষণ নীরব হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'আপনি কী ঠিক বলছেন!'

'এই দেখো বাবা, এই আমার ব্যাগ। ব্রজের জন্য একটা নতুন ধুতি আর পাঞ্জাবি এনেছি। এক কেজি নলেন গুড়ের সন্দেশও এনেছি। সাতীরার বিখ্যাত এই সন্দেশ। ব্রজের সেই চিঠিটাও সঙ্গে আছে।'

বজলে করিম ধুতি, পাঞ্জাবি, সন্দেশ সবই ব্যাগ থেকে বের করলেন। শেষে ডাইরির ভেতর থেকে বের করে বন্ধু ব্রজের বাঁকা হাতের লেখা চিঠিটা দেখালেন। চিঠিটা দেখেই আঁতকে ওঠে লোকটা, 'হ্যাঁ, এ তো আমার বাবার হাতের লেখাই। কিন্তু বাবা তো প্রায় দুবছর আগেই স্বর্গে পাড়ি দিয়েছেন। এ চিঠিটা লেখা ২৯শে শ্রাবণ ১৩৮০তে। আর বাবা মরেছে ২২শে কার্তিক ১৩৭৮-এ। এটা কীভাবে সম্ভব!'

বজলে করিমের সারা শরীর আতঙ্কে কাঁটা দিয়ে ওঠে– 'তাহলে কাল সাঁঝে কে দরজা খুলে আমাকে ভেতরে আসতে বলল? আমার সাথে কথা বলল, বিশ্রাম নিতে বলল, খাবার সাজিয়ে দিলো... কে-কে সে?'

লোকটা মৃদু স্বরে বলল, 'এ বাড়িতে আমাদের কেউ থাকে না। বাবা বেঁচে থাকতে এখানেই বেশি সময় কাটাতেন। বাবার লেখালেখির অভ্যেস ছিল। বই পড়ার নেশাটাও ছিল জীবনের শেষ পর্যন্ত। নিরিবিলিতে লেখাপড়া করতে পছন্দ করতেন। সেজন্য এ ঘরটা তৈরি করেন নিজ হাতে।

ঘরটা এখন সব সময় তালা দেওয়া থাকে। কালেভদ্রে তালা খুলে ঘরটা ঝাড়পোঁছা করা হয়। তা আপনি যদি বাবার বন্ধু হন এবং যা বললেন তা যদি ঠিক বলে থাকেন, তাহলে কাল সন্ধ্যায় যে আপনাকে এ ঘরে ডেকে নিয়েছিল সে আর কেউ নয়– বাবার ভূত!'

'ভূত? ব্রজনাথের ভূত! ও ব্রজনাথ!' বজলে করিমের ভেতরটা আতঙ্কে কেঁপে ওঠে। গতরাতের ভয়ংকর ঘটনা তাকে এক অকল্পনীয় বাস্তবতার মাঝপথে দাঁড় করিয়ে দেয়।

'...আর এ চিঠি? চিঠিটা তো ব্রজেরই হাতের লেখা। তার স্বরটাও তো মিথ্যে হবার নয়। তাহলে, তাহলে...?'

এই তাহলের কোনো উত্তর খুঁজে পান না বজলে করিম।

এল খুশির ঈদ

সরদার আবুল হাসান

তিরিশ রোজার ভেলায় চড়ে
এল খুশির ঈদ
আনন্দে তাই খোকা-খুকুর
দুই চোখে নেই নিদ।

গরিব-ধনী নেই ভেদাভেদ
আজকে ঈদের দিনে
সব হারাদের খাবারদাবার
আমরা দিব কিনে।

জীবন ওদের সুখের হবে
ফুটবে মুখে হাসি
বুকের মাঝে উঠবে জেগে
স্বপ্ন রাশি রাশি।

দ্বেষ-হিংসা মান-অভিমান
থাকবে নাকো জিদ
খোশমেজাজে বলবে সবাই
'ঈদ মোবারক ঈদ'।

ঈদের দিন

সানজানা শরীফ

ঈদ মানে খুশির দিন
বাজিয়ে দেয় সাম্যর বীণ।
ঈদ মানে কোলাকুলি
হিংসা-বিদ্বেষ ভুলি।

ঈদ মানে মজার মজার খাবার
ভেদাভেদ ভুলে আহার।
ঈদ মানে আনন্দের ভেলা
নয়কো কাউকে হেলা।

১০ম শ্রেণি, মতিঝিল সরকারি বালিকা বিদ্যালয়

সুজন ও কালামানিকেরা

আহমেদ রিয়াজ

ভাত খাচ্ছিল সুজন। অনেকক্ষণ ধরে সুজনের খাওয়া দেখছিলেন মা। বললেন, 'সুজন, একটু ভালো করে খেতে পারো না?'

'ভালো করেই তো খাচ্ছি মা।'

'এই যে প্লেটের চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে খাচ্ছ, দেখতে কি ভালো লাগছে? তুমিই বলো।'

'সরি মা।'

'প্রতি বেলায় সরি বললে হবে বাবা?'

'হুম। প্রতি বেলায় তো তুমি থাকো না মা।'

'তা থাকি না। কিন্তু আমি জানি, প্রতি বেলাতেই তুমি এভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে খাও। নিজেকে তো শুধরাতে হবে। ধরো তোমার সামনে তোমার মা এভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ভাত খাচ্ছে। প্লেটের চারপাশে খাবার ছড়িয়ে আছে। তোমার কেমন লাগবে দেখতে? নিশ্চয়ই ভালো লাগবে না।'

'তাহলে তো ভালোই হয় মা। আমার দল ভারী হবে।'

বলেই একটা হাসি দিল সুজন। মুখের ভিতরে থাকা অর্ধচিবোনো ভাতগুলো উঁকিঝুঁকি মারল। দেখে বিরক্ত হলেন মা। কী বলবেন! কতদিন বলেছেন, মুখে খাবার নিয়ে কথা বলতে নেই। একটা কথা বললে মনে রাখে না। যাচ্ছে-তাই।

মা একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। নাহ্। এই ছেলেকে নিয়ে তো পারা যাচ্ছে না। অবশ্য সুজনের ভালো দিকগুলোই বেশি। নিজে নিজে স্কুলে যায়। স্কুল থেকে সোজা বাসায় ফিরে আসে। ঠিকমতো পড়াশোনাও করে। ওর পড়াশোনা নিয়ে তাকে মাথা ঘামাতে হয় না। কিছু না বুঝলে মায়ের কাছে জানতে চায়। নয়তো বাবার কাছে জিজ্ঞেস করে। নিজের পড়াটা ঠিকই আদায় করে নেয়। প্রাইভেট পড়তে হয়নি কখনো। আর প্রাইভেট না পড়ার কারণে স্কুলের পরীক্ষাগুলোতে

নাম্বার কম পায়। তা নিয়ে সুজনের বাবা কিংবা মা-কারোরই মাথাব্যথা নেই। স্কুলের নাম্বার দিয়ে কী হবে? মানুষ হওয়াটাই বড়ো কথা।

অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিলেন মা। বললেন, 'খারাপ কাজে কখনো দল ভারী করতে নেই সুজন। দল ভারী করতে হয় ভালো কাজে।'

ততক্ষণে মুখের খাবারটুকু চিবোনো শেষ করেছে ছেলেটা। নতুন করে ভাতের লোকমা মুখে তুলতে তুলতে বলল, 'কিন্তু মা, চারপাশে তো দেখি খারাপ কাজেই দল বেশী ভারী হয়।'

এ কথার পিঠে আরেকটা কথা বলতে গিয়েও চুপ হয়ে গেলেন মা। বললেন, 'কতদিন তোমাকে বলেছি, মুখে খাবার নিয়ে কথা বলবে না। কথা শোনো না কেন?'

বলেই সুজনের সামনে থেকে সরে গেলেন। সামনে থাকলে এসব আর দেখতে হবে না।

দুই

নাশতার টেবিলে বসে আছে সুজন। ছুটির দিন। ছুটির দিনে কারোরই হুড়োহুড়ি থাকে না। বাবার অফিস নেই। মায়ের বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নেই। সুজনের মা একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। সুজনের স্কুল নেই। ছুটির দিনে সবকিছু খানিকটা ঢিলেঢালা ভাবেই হয়। নাশতার আইটেম হয় অন্যরকম। আজ যেমন খিচুড়ি। কিন্তু খিচুড়ি দেখেই সুজনের মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে আছে। ও খিচুড়ি দেখতে পারে না। কেন যে মানুষ খিচুড়ি খায়?

সেই তখন থেকে তাড়া দিচ্ছেন মা, 'খিচুড়িতে হাত দাও সুজন।'

'কীভাবে দেবো? অনেক গরম।'

'আস্তে আস্তে খেতে থাকো। দেখবে ঠান্ডা হয়ে যাবে।'

বাবা বললেন, 'খিচুড়ি খেতে হয় গরম গরম। ঠান্ডা হয়ে গেলে আর ভালো লাগে না।'

সুজন বলল, 'আমার গরম খেতে ভালো লাগে না।'

বাবা বললেন, 'ভালো না লাগলেও কিছু খাবার গরম গরম খেতে হয়।'

এবার হুট করে রেগে গেল সুজন। 'ধ্যাৎ। আমি খাবোই না।'

বলেই খাবার ছেড়ে উঠে গেল।

মা-বাবা দুজনই অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন সুজনের দিকে। রাগে কাঁপছিলেন মা। কাঁপতে কাঁপতে বললেন, 'ছেলেটা কী রকম বেয়াড়া হয়ে উঠছে দেখেছ?'

বাবা মুচকি হেসে বললেন, 'বয়সটাই এরকম। ওকে এখন আমাদের সহায়তা করা দরকার। উলটো রাগারাগি না করে ওকে বুঝিয়ে বলা দরকার। আমরাও যদি ওর সঙ্গে রাগ করি তাহলে ও আরো বেশি বেপরোয়া হয়ে উঠবে।'

মা শান্ত হলেন।

তিন

একটা খবর পড়ছেন বাবা। খাবার টেবিলে বসে সে খবর শুনছেন মা আর সুজন।

'খাবারের অপচয় রোধে অস্ট্রেলিয়ায় প্রশিক্ষণ'

খাবারের অপচয় ঠেকাতে দারুণ এক কর্মসূচি হাতে নিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেনের সিটি কাউন্সিলর পিটার ম্যাটিক।

মা জানতে চাইলেন, 'অস্ট্রেলিয়ানরা কি খাবারের অপচয় করে?'

বাবা বললেন, 'আগে পুরো খবরটা শোনো। তারপর প্রশ্ন করো।'

আবার পড়তে শুরু করলেন বাবা।

'প্রশিক্ষণটা হবে দেড়মাসের। এই দেড়মাসের মধ্যে শহরের বাসিন্দাদের সচেতন করা হবে, যাতে তারা খাবারের অপচয় না করেন। প্রশিক্ষণের শিরোনাম-লাভ ফুড, হেইড ওয়েস্ট। মানে খাবারকে ভালোবাসো, অপচয়কে ঘৃণা করো। আমাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরান শরীফের সুরা আল ইসরার ২৭ নম্বর আয়াতে আছে– কিছুতেই অপব্যয় করো না। নিশ্চয়ই অপচয়কারী শয়তানের ভাই।

যাই হোক, ব্রিসবেনে প্রতিবছর ৯৭ হাজার টন খাবার অপচয় হয়। গড়ে একজন বাসিন্দা যে খাবার কেনে তার ২০ শতাংশই অপচয় করে। এই অপচয় কমানোর জন্য ছয় সপ্তাহের কর্মসূচির প্রস্তাব করেন সিটি কাউন্সিলর।

কেমন লাগল খবরটা?'

মা বললেন, 'খুবই সুন্দর খবর। এরকম খবর আমাদের আরো সচেতন করবে। আমরা যাতে খাবার অপচয় না করি।'

বাবা এবার সুজনের কাছে জানতে চাইলেন, 'তোমার কাছে কেমন লাগল খবরটা?'

'খবরটা কি তুমি আমাকে উদ্দেশ্য করে বলেছ বাবা?'

'হ্যাঁ। কারণ তুমি খাবার অপচয় করো। খাবার অপচয় মোটেই ভালো কাজ নয় সুজন। পৃথিবীর তিন ভাগের এক ভাগ মানুষ না খেয়ে থাকে। অন্যদিকে কিছু মানুষ অতিরিক্ত খায়। এটাও এক ধরনের অপচয়। আর কিছু মানুষ খাবার নষ্ট করে। যদি আমরা সবাই এই অপচয় না করতাম, তাহলে পৃথিবীর কোনো মানুষ না খেয়ে থাকত না।'

সুজন বলল, 'আমার খিদে পেয়েছে, খেতে দাও মা।'

বাবা বললেন, 'খিদে তো পাবেই। সকালে ঠিক মতো খাওনি। খাবার অপচয় করেছ। এখন কিন্তু খাবার অপচয় করবে না। মনে থাকবে বাবা?'

চট করে রেগে গেল সুজন। 'ধ্যাৎ, তোমরা কেবল উপদেশ দাও। এত্ত উপদেশ শুনতে ভালো লাগে না।'

মা বললেন, 'এভাবে বলতে হয় না সুজন। তোমার যে আচরণগুলো খারাপ সেগুলো যদি আমরা ধরিয়ে না দেই, তাহলে কে ধরিয়ে দেবে? আমরাই তো বলব। কারণ আমরা তোমার মা-বাবা। তোমার ভালোমন্দ আমাদেরকেই তো দেখিয়ে দিতে হবে।'

'কই? আমার ভালো কিছু নিয়ে তো কখনো বলো না?'

বাবা বললেন, 'এটা অবশ্য ঠিক কথা বলেছ। এই তো তুমি আমাদের একটা দুর্বলতা দেখিয়ে দিয়েছ। আমরা এটা মনে রাখব।'

মা বললেন, 'আমাদের সুজন খুব ভালো ছেলে। ঠিক মতো লেখাপড়া করে। কারো সঙ্গে মারামারি করে না। তবে নিয়মিত খাবার অপচয় করে।'

নাহ্। এবার আরো খেপে গেল সুজন। খাবার টেবিল থেকে উঠে যেতে ইচ্ছে করছে ওর। কিন্তু উঠতে পারছে না। একে তো খিদের চোটে পেট চোঁ চোঁ করছে। তার ওপর মা আজ ওর প্রিয় তরকারি রান্না করেছেন। গরম গরম খাবারের সুবাস ওর নাকে ঝাপটা মারছে। পুরো মুখ লালায় ভরে গেছে।

চার

মা বললেন, 'একটা খবর আছে সুজন।'

'কী খবর মা?'

'আমি আর তোমার বাবা অনেকদিন দেশে থাকছি না।'

'কোথায় যাচ্ছ তোমরা?'

'তোমার বাবা যাচ্ছেন কানাডা। আর আমি নরওয়ে।'

'বাবা কেন যাচ্ছেন?'

'অফিসের কাজে। আটমাস থাকবেন।'

'আর তুমি?'

'আমি ছয়মাস থাকব।'

'ছয়মাস পর তুমি দেশে ফিরে আসবে?'

'না।'

'তাহলে?'

'কানাডা যাবো। তোমার বাবার কাছে। সেখান থেকে দুজন একসঙ্গে দেশে ফিরব।'

'আমি? আমি কোথায় থাকব?'

'তোমার বাবা আসুক। তোমার বাবার সঙ্গে আলাপ করে ঠিক করা হবে-তুমি কোথায় থাকবে?'

বলতে না বলতেই বাবা এলেন। এসেই মায়ের কাছে জানতে চাইলেন, 'সুজনকে বলেছ?'

'বলেছি। আমার কেউ থাকব না। সুজন কোথায় থাকবে?'

বাবা জানতে চাইলেন, 'তুমিই বলো সুজন, কোথায় থাকতে চাও?'

সুজন কিন্তু মনে মনে খুশি। বাবা-মায়ের উপদেশ নেই। নির্দেশ নেই। আহা। কী স্বাধীনতা! কিন্তু সেটা প্রকাশ করল না। মুখ ভার করে রাখল ইচ্ছে করে। যেন ও খুশি নয় মোটেই।

অনেকক্ষণ ধরে ভাবতে লাগল সুজন। বাবা বললন, 'এখনই বলার দরকার নেই। তুমি দুদিন ভাবো। তারপর আমাদের জানালেই হবে। তুমি যেখানে থাকতে চাইবে, আমরা তোমাকে সেখানেই রাখব। তবে যেখানেই থাকতে চাও না কেন, তুমি যাতে

ভালো থাকো, আনন্দে থাকো–আমার আর তোমার মায়ের সেটাই চাওয়া।'

পাঁচ

মা আর বাবা গোছগাছ শুরু করে দিয়েছেন। সকালে স্কুলে যাওয়ার আগে সুজন দেখে যায়, মা ব্যাগ গোছাচ্ছেন। দুপুরে স্কুল থেকে ফিরে দেখে বাবা ব্যাগ গোছাচ্ছেন। মনে মনে বিরক্ত হয় সুজন।

বিকেলে বাবাকে ব্যাগ গোছাতে দেখে সুজন জানতে চায়, 'তোমার ফ্লাইট কবে বাবা?'

'তোমার মায়ের আর আর আমার একই দিনে ফ্লাইট।'

'কবে?'

'সামনের মাসের তিন তারিখ।'

'এখনও তো আট দশ দিন আছে। এত আগে গোজগাছের কী আছে?'

'আগে থেকে গুছিয়ে রাখলে সুবিধা। নইলে পরে যদি কিছু নিতে ভুলে যাই?'

'হুম!'

বাবা এবার সুজনের দিকে তাকালেন। তিনি ঠিক বুঝতে পারলেন, সুজন বিরক্ত। বাবা ওর মাথায় হাত বোলালেন। বললেন, 'তোমার চুলগুলো তো অনেক বড়ো হয়ে গেছে। চুল কাটাবে না?'

'না।'

'কেন?'

'ইচ্ছে করছে না।'

'বড়ো চুলের জন্য স্কুলে কিছু বলে না?'

জবাব দিল না সুজন। ইচ্ছে করছে না। কেন ইচ্ছে করছে না কে জানে? বাবা আর মা দুজনই দেশের বাইরে যাচ্ছেন, প্রথমে খুশি হয়েছিল সুজন। এখন কেন যেন মেজাজ খারাপ হচ্ছে ওর। কেন হচ্ছে জানে না।

বাবা ওর মাথাটাকে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন। তারপর দীর্ঘ একটা নিশ্বাস নিলেন। বললেন, 'আশা করি তুমি ভালো থাকবে।'

'চেষ্টা করব।'

'কিন্তু কোথায় থাকবে কিছু ভেবেছ?'

'না।'

'তাহলে কীভাবে হবে? তোমাকে একটা নিরাপদ জায়গায় না রেখে তো আমরা যেতে পারব না। তোমার থাকার জায়গার অনেক অপশন আছে।'

'আমি কোথাও যেতে চাই না। এখানেই থাকব।'

বাবা হাসলেন। সুজনের কপালে একটা চুমু খেলেন। বললেন, 'আমার পাগল বাবা। এখানে কীভাবে থাকবে? কে তোমার দেখাশোনা করবে? কে তোমাকে রান্না করে দেবে?'

'আমি নিজেই পারব।'

বাবা আবারও হাসলেন। আবারও একটা চুমু খেলেন সুজনের কপালের ঠিক মাঝখানটায়। বললেন, 'আচ্ছা, তোমার মা আসুক। তোমার মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে আমরা সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নেব। ঠিক আছে বাবা?'

ঘাড় নেড়ে সায় জানাল সুজন। আজ ওর খেলতে যেতেও ইচ্ছে করছে না। টিভি দেখবে? টিভি দেখতেও ইচ্ছে করছে না। আজ ওর কিছুই করতে ইচ্ছে করছে না। সব কিছুতে ওর এত অনিচ্ছা কেন, নিজেও জানে না।

ছয়

দরজা খুলেই সুজন অবাক। 'নানাজান আপনি?'

নানাজান মুচকি হাসলেন। নানার গালে ভাঁজ পড়ল। হাসলে নানার ডান গালে একটা ভাঁজ পড়ে। নানাজান বললেন, 'কেন রে, বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?'

লজ্জা পেল সুজন। ইদানীং একটুতেই লজ্জা পায় ও। বলল, 'তা হচ্ছে। কিন্তু হঠাৎ?'

'আসতে নেই বুঝি?'

আরো লজ্জা পেল সুজন। থতমত খেল। এখন কী বলবে বুঝতে পারছে না। নানাজানই ওকে এই আপদ থেকে রেহাই দিলেন। বললেন, 'বাইরেই দাঁড় করিয়ে রাখবি? ভিতরে আসতে বলবি না?'

দরজা থেকে সরে দাঁড়াল সুজন। বলল, 'এসো নানাজান।'

বলেই নানাজানের হাত থেকে ভারী একটা থলে নিয়ে নিল। নানাজানের দুই হাতে দুটো ভারী থলে।

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে নানাজান বললেন, 'তোর মা কোথায়?'

‘বাসায় নেই।’

‘ভার্সিটিতে গেছে বুঝি?’

‘না। মা আর বাবা মিলে শপিং-এ গেছেন।’

‘ও আচ্ছা। তা তোকে একা বাসায় রেখে গেছেন, ঘটনা কী? ঝামেলা বেশি করিস বুঝি?’

এবার সুজনের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। ও ঝামেলা করে? নিশ্চয়ই নানাজানকে জানিয়েছেন মা। নইলে নানাজান এরকম কথা বলবেন কেন?

সুজন বলল, ‘আপনি আসবেন বলেই আমাকে বাসায় রেখে গেছেন।’

এবার হো হো করে হেসে উঠলেন নানাজান। বললেন, ‘বুঝেছি। তাহলে আমাকে দেখে অবাক হয়েছিস কেন রে?’

এবার লা জওয়াব হয়ে গেল সুজন। সত্যিই তো! ও যদি জানত-ই নানাজান আসবেন, তাহলে অবাক হলো কেন?

সাত

খাবার নিয়ে বসে আছে সুজন। ওর নাকি কিছুই খেতে ইচ্ছে করছে না। বাবা-মা দুজনই অবাক। এ বয়সে তো খাবারে অনীহা হওয়ার কথা নয়! সুজনের কপালে বামহাতের তালু চেপে ধরলেন মা। বললেন, ‘নাহ্। জ্বর তো নেই।’

বাবা বললেন, ‘এটা কোনো কথা হলো সুজন? খেতে বসে কেউ বলে, খেতে ইচ্ছে করছে না?’

নানাজান বললেন, ‘এটা তো ভালো খবর নয় নানাজান। এ বয়সে খাবে-দাবে, মজা করবে, লেখাপড়া করবে। গাছে চড়বে। মাঠে দৌড়ে বেড়াবে।’

মা বললেন, ‘মাঠ কোথায় পাবো?’

বাবা বললেন, ‘চড়ার মতো গাছ কোথায়?’

নানাজান বললেন, ‘এ জন্যই তো খিদে পায় না। খাবার হজম করার জন্য কিছু তো করতে হবে। একটু দৌড়ঝাঁপ। একটু ছোটাছুটি।’

সুজন বলল, ‘আমি আর খাবো না। আমার আর খেতে ইচ্ছে করছে না।’

বাবা বললেন, ‘তাহলে আরেকটা খবর শোনাই।’

বলেই পকেট থেকে একটা পেপারকাটিং বের করলেন। বাবার পকেটে নানান রকম পেপার কাটিং থাকে। পছন্দের খবরগুলো কেটে সংগ্রহ করে রাখেন। কাটিং-এর নিচে বা পাশে পত্রিকার নাম, তারিখ লিখে রাখেন।

খবর পড়তে লাগলেন বাবা-

খাবার শেষ না করলে জরিমানা!

বিশ্বের প্রায় একশ কোটি মানুষ দিনে দুবেলা পেট পুরে খেতে পায় না। সেখানে রেস্টুরেন্টে বসে পুরো প্লেটের খাবার না খেয়ে অপচয় করেন অনেক মানুষ। এই অপচয়ের বিরুদ্ধে সচেতন হচ্ছে বিশ্বের বড়ো বড়ো রেস্টুরেন্ট। টাইমস অব ইন্ডিয়ার খবরে জানা যায়...’

হঠাৎ থেমে গেলেন বাবা। বললেন, ‘টাইমস অব ইন্ডিয়া কী জানো তো সুজন?’

‘সংবাদ সংস্থা হবে।’

‘সংবাদপত্র। পৃথিবীর সবচেয়ে প্রচারিত দৈনিক খবরের কাগজ হিসেবে গিনেস রেকর্ডে নাম তুলেছে টাইমস অব ইন্ডিয়া। আচ্ছা সে যাই হোক। টাইমস অব ইন্ডিয়ার খবরে জানা যায়, ফ্রান্সের একটি রেস্টুরেন্ট এরকম জরিমানার ব্যবস্থা করেছে। তাদের রেস্টুরেন্টে যারা খেতে আসবে তাদের কেউ যদি পুরো খাবার খেয়ে শেষ না করে, তাদের জরিমানা গুণতে হবে পাঁচ ফ্রাঁ। ফ্রাঁ মানে ফ্রান্সের মুদ্রা।’

সুজন বলল, ‘আমার খাবার আমি সবটা খাই বা না খাই, সেটা আমার ব্যাপার। এর মধ্যে আবার জরিমানা কেন?’

বাবা বললেন, ‘তুমি যেখানে খাবার অপচয় করছ, সেখানে অন্য মানুষ যে না খেয়ে থাকে! ওই রেস্টুরেন্টের প্রধান ব্যবস্থাপক জিওভানি তাফুরো জানান, তাদের খদ্দেররা সবচেয়ে বেশি খাবার অপচয় করেন দুপুরে। মানে দুপুরের খাবার অপচয় হয় বেশি। এখন যেমন তুমি করছ।’

রেগে গেল সুজন, ‘ধ্যাৎ। খবরের মধ্যে তুমি আমাকে টানছ কেন? আমি কি প্রতিদিন খাবার অপচয় করি?’

নানাজান বললেন, ‘একদিনই বা করবে কেন? খাবার অপচয় মোটেই ভালো কথা নয় নানাজান।’

বাবা বললেন, ‘খবরটা কিন্তু শেষ হয়নি। খবরের উপসংহারও আছে।’

মা বললেন, 'উপসংহারটা কী।'

বাবা বললেন, 'জিওভানি তাফুরো খুব দুঃখ নিয়ে জানিয়েছেন, খাবার অপচয়ের বিষয়ে গ্রাহকদের আমি সচেতন করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু অনেকেই কথা কানে নেয়নি। প্রতিদিন প্রচুর টাকার খাবার বাইরে ফেলে দিতে হচ্ছে। কয়েকদিন ধরে বিষয়টা আমাকে ভীষণ পীড়া দিচ্ছিল।'

মা বললেন, 'আমাদের দেশেও কিন্তু এরকম কিছু সংগঠন আছে। ওরা বিয়ে বাড়ি কিংবা কোনো অনুষ্ঠানে ফেলে দেয়া খাবার নিয়ে যায়। ক্ষুধার্ত মানুষকে সে খাবার বিতরণ করে।'

বাবা বললেন, 'এখনও কিন্তু আমি উপসংহারে আসিনি। উপসংহারটা হলো-বিশ্ব খাদ্য সংস্থার তথ্য থেকে জানা যায়, প্রতি বছর মোট উৎপাদিত খাদ্যের অন্তত এক-তৃতীয়াংশ অপচয় হয়। প্রতি বছর বিশ্বে খাবার অপচয় হয় ৭৫ হাজার কোটি টন। এ নিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা খুবই উদ্বিগ্ন এবং শঙ্কিত। কাজেই বাবা, খাবার অপচয় না করে বরং খাবারটা খেয়ে ফেল।'

সুজন বলল, 'আমি মাকে কতবার বলেছি, এত দিও না। তবু...'

মা বললেন, 'হুঁ, এখন মায়ের দোষ!'

বলেই খাবার টেবিল থেকে উঠে গেলেন মা। রাগ করে নয়। মায়ের খাওয়া শেষ। খাওয়া শেষ করে মা কখনো বসে থাকতে পারেন না।

খাওয়া শেষ করে নানাজানের আনা থলেগুলোর ভিতর থেকে জিনিসপত্র বের করতে লাগলেন মা। নারকেল, নারকেলের নাড়ু, মোয়া, ঢেকিছাঁটা চালের গুঁড়ো, গুড়, মুড়ি, চিড়া-একের পর এক জিনিসপত্র বেরোতেই লাগল।

মা বললেন, 'এত কিছু কেন আনতে গেলেন বাবা? কে খাবে? আমরা তো থাকব না।'

নানাজান বললেন, 'আমার নাতি খাবে।'

নাড়ু ছিল একটা বয়ামে। নাড়ুর বয়াম খুলতে খুলতে মা বললেন, 'নাড়ু আমার ভীষণ প্রিয়। দেখি একটা নাড়ু খেয়ে।'

নাড়ুর বয়ামের ছিপি খুলে মা অবাক! তাকালেন নানাজানের দিকে। এ কী! নানাজানকে বললেন, 'নাড়ু এত কম কেন বাবা?'

নানাজান বললেন, 'কম মানে? আমার সামনে তোর মা বয়াম ভরে দিয়েছে।'

মা এবার বয়াম এনে নানাজানের সামনে ধরলেন। নানাজান অবাক হয়ে দেখলেন, বয়ামের তলায় কয়েকটা মাত্র নাড়ু পড়ে আছে।

মা বললেন, 'তাহলে নাড়ু খেয়েছে কে?'

বলেই তাকালেন সুজনের দিকে। দেখলেন খুব মনোযোগ দিয়ে ভাত খাচ্ছে সুজন। টুঁ শব্দটিও করছে না। বুঝে গেলেন মা। বয়ামের নাড়ু কোথায় গেছে। এটাও বুঝলেন, কেন আজ সুজনের জন্য দুপুরের খাবার বেশি হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কিছু বললেন না। বললে খাবার পুরোটা না খেয়েই উঠে যাবে সুজন।

আট

সুজন বলল, 'তার মানে আমি নানাবাড়ি গিয়ে থাকব?'

বাবা বললেন, 'তোমার এই সিদ্ধান্তে আমার সমর্থন আছে। তুমি খুব ভালো সিদ্ধান্ত নিয়েছ সুজন। আরেকবার প্রমাণিত হলো তোমার বুদ্ধি আছে।'

সুজন বলল, 'কিন্তু আমি তো এখনও কিছু বলিনি।'

'আমি যে তোমার নানাজানের কাছে শুনলাম!'

হুম। নানাজানের কাছে অবশ্য বলেছে ও। নানাবাড়িতে একটা বছর থাকতে পারে কি না। নানাজান হাসতে হাসতে বলেছেন, 'তাহলে তো খুবই ভালো হয় নানাজান। গ্রামটা তোমার দেখা হবে। গ্রাম প্রধান দেশে থাকো। যদি কাছে থেকে গ্রামটাই না দেখো, তাহলে কি হয়?'

কিন্তু তার মানে তো এই নয় যে ও নানাবাড়িতেই গিয়ে থাকবে। সুজন বলল, 'গ্রামে গিয়ে কীভাবে থাকব? আমি যাবো না।'

বাবা বললেন, 'ঠিক আছে। তাহলে কোথায় থাকতে চাও? তোমাকে কোথাও না কোথাও রেখে যেতে তো হবে!'

কী জবাব দেবে সুজন? ও নিজেই জানে না, কোথায় গিয়ে থাকতে পারবে? কোথায় গিয়ে থাকলে ও ভালো থাকবে।

চুপ করে রইল ও। বাবা বললেন, 'এক কাজ করলে কেমন হয়? কিছুদিন নানাবাড়ি গিয়ে থাকো। যদি

ভালো না লাগে, তখন না হয় অন্য কিছু ভাবা যাবে। গিয়েই দেখো না। ভালো লাগতেও পারে।'

মা আর বাবা যখন ওকে ঠিক করতে বলেছিলেন, কোথায় ও থাকতে চায়-আসলে ও সিদ্ধান্ত নিতে পারছিল না। কিন্তু বাবা যখন বলছেন নানাবাড়ি গিয়ে কিছুদিন থেকে আসতে, ওরও মনে হলো দেখাই যাক। জানাল সুজন, 'ঠিক আছে বাবা। তুমি যেভাবে বলবে সেভাবেই হবে।'

বাবা ওকে কাছে টেনে নিলেন। বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'সুজন, তোমাকে এভাবে একা ছেড়ে যেতে আমাদের খারাপ লাগছে। কিন্তু উপায় যে নেই! অনেক সময় অনেক পরিস্থিতি তৈরি হয় আমাদের জীবনে। সেগুলোকে তুমি যদি এনজয় করতে শিখো, তাহলে আর কোনো সমস্যা থাকে না। আমার ধারণা তুমি আমার কথা বুঝতে পারোনি। কিন্তু একদিন ঠিকই বুঝতে পারবে।'

নয়

উফ্। নানাবাড়ি এত সুন্দর! মুগ্ধ চোখে চারপাশ দেখতে লাগল সুজন।

এর আগেও বেশ কয়েকবার নানাবাড়ি এসেছে ও। কিন্তু তখন কেন এত সুন্দর লাগেনি? নানাজান কি ওর দুচোখে মুগ্ধতা দেখতে পেয়েছেন? মনে হয় দেখতে পেয়েছেন। নইলে জানতে চাইবেন কেন, 'কি রে, তোর নানাবাড়ি কেমন?'

'অসাধারণ!'

'কী কারণে অসাধারণ মনে হচ্ছে? আগেও তো এসেছিস। তখন তো অসাধারণ বলিসনি।'

'সেটাই তো ভাবছি নানাজান। তখন অসাধারণ মনে হয়নি কেন?'

মুচকি হাসলেন নানা। বললেন, 'আমি কিন্তু বুঝে ফেলেছি।'

'কেন নানা?

'তুই তো আসিস কেবল শীতকালে। তখন কি প্রকৃতি এত সবুজ থাকে? বর্ষায় যদি না আসিস, গ্রামবাংলার আসল রূপ কখনোই দেখতে পাবি না।'

হুম। তাই তো! চারদিকে কেবল সবুজ আর সবুজ। এত্ত সবুজ! সবুজ সাম্রাজ্য। মুগ্ধ হয়ে সবুজ দেখতে লাগল সুজন। সবুজে সবুজে ঘোর লেগে গেল ওর দুচোখে। ঘোর ভাঙল নানাজানের কথায়, 'চলো তোমাকে আমাদের ধানক্ষেত দেখাব।'

হাঁটতে হাঁটতে...

এ কোথায় এল সুজন! বিশাল ধানক্ষেত। বাতাসে ধানগাছগুলো দুলছে। ঢেউয়ের মতো। সবুজ সাগরের ঢেউ।

সুজন জানতে চাইল, 'এগুলো কী ধান নানাজান?'

'কালামানিক।'

'কালামানিক! এরকম ধানের নাম তো জীবনেও শুনিনি। ধানগুলো কি কালো কালো হয়?'

'হ্যাঁ। নিজের চোখেই দেখতে পাবে।'

'কিন্তু আমি তো তিন ধরনের ধানের নাম জানি শুধু। আউশ, আমন আর বোরো।'

নানাজান এবার হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, 'আউশ, আমন, বোরো কিন্তু কোনো ধানের নাম নয়।'

সুজনের কৌতূহল আরো বেড়ে গেল। 'মানে?'

মুখে হাসি ঝুলিয়ে রেখেই নানাজান বললেন, 'বাংলাদেশে প্রধানত তিনটি কৃষি মৌসুম। এ মৌসুমগুলোর নাম রবি মৌসুম, খরিপ-১ মৌসুম এবং খরিপ-২ মৌসুম। সাধারণত অগ্রহায়ণ থেকে চৈত্র পর্যন্ত রবি মৌসুম। বৈশাখ থেকে শ্রাবণ খরিপ-১ মৌসুম এবং শ্রাবণ থেকে অগ্রহায়ণ 'খরিপ-২ মৌসুম ধরা হয়। প্রতি চারমাসে একটা করে মৌসুম।'

যতই শুনছে ততই অবাক হচ্ছে সুজন। 'এই আউশ, আমন আর বোরো হচ্ছে ধান চাষাবাদের মৌসুমের নাম। আউশ ধানের মৌসুম হচ্ছে- বৈশাখ থেকে শ্রাবণ। আউশ মৌসুমে চাষ করা ধানের নামগুলো এরকম- ধারিয়াল, দুলার, হাশিকলমি, কটকতারা, কুমারি, পানবিরা, কালামানিক, শনি, শংকবটি, ষাইটা, জাগল, কালোবকরি, ভইরা, মূলকে আউশ, ভাতুরি, দুধেকটকি, কাদোমনি, খরাজামরি ইত্যাদি।'

'নামগুলো তো দারুণ নানাজান।'

'আমন ধানের মৌসুম শ্রাবণ থেকে অগ্রহায়ণ। বীজতলায় ধানের চারা তৈরি করতে হয়। তারপর জমিতে রোপণ করা হয়। আমন মৌসুমে চাষ

করা ধানগুলোর মধ্যে আছে-দাদখানি, দুধসর, হাতিশাইল, ইন্দ্রশাইল, যশোবালাম, লতিশাইল, পাটনাই, ঝিংগাশাইল, তিলককাচারি, বাদশাভোগ, কাটারিভোগ, কালিজিরা, রাধুনিপাগল, বউআদুরি, চিনিগুড়া, মহোনভোগ, বড়চালানি, দিঘা, বাঁশফুল ইত্যাদি।'

'দাদখানি, কাটারিভোগ, কালিজিরা আর চিনিগুড়া ধানের নাম শুনেছি নানাজান।'

'হুম। পোলাওয়ের চাল হিসেবে ওই নামগুলো বেশি

শোনা যায়। আর বোরো ধানের মৌসুম হচ্ছে অগ্রহায়ণ থেকে চৈত্র। এ ধানও প্রথমে বীজতলায় চারা তৈরি করা হয়। তারপর রোপণ করা হয়। এ ধান চাষ করতে প্রচুর পানির দরকার হয়। বোরো ধানের মধ্যে রয়েছে-খৈয়াবোরো, জাগলিবোরো, টুপাবোরো, মুখকালালি, গঞ্জালি,

কালোসাইটা, সোনালিবোরো, তুফান, টেপাবোরো, বলংগা, ষাটেবোরো, বোয়ালিবোরো ইত্যাদি।'

'নানাজান, তাহলে আমরা তো ধানের কিছুই জানি না।'

এবার একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন নানাজান। বললেন, 'ভাত ছাড়া আমাদের চলেই না। যে ধান থেকে চাল পাই, চাল থেকে ভাত-সে ধান সম্পর্কে আমাদের জানার ইচ্ছেও তো দেখি না।'

হঠাৎ একটা দমকা বাতাস ছুটে এল। ধানের ক্ষেতের দিকে তাকাল সুজন। আবার সেই সবুজ ঢেউ। সবুজ সাগরের বিশাল বিশাল ঢেউ। সে ঢেউ থেকে কী মিষ্টি একটা গন্ধ এসে আছড়ে পড়ল সুজনের নাকে। নাক টেনে লম্বা একটা শ্বাস নিল সুজন। আহ্!

দশ

মাশুক ভাই বললেন, 'যাবি সুজন?'

'কোথায়?'

'হাটে।'

'যাব।'

'তাহলে চটপট তৈরি হয়ে নে।'

হাটে যেতে দারুণ লাগে সুজনের। মাশুক ভাইয়ের সঙ্গে যেতে বেশি ভালো লাগে। মাশুক ওর মামাতো ভাই। বড়ো মামার ছেলে। ওর চেয়ে দু'বছরের বড়ো। নানাবাড়ি এসে মাশুক ভাইয়ের সঙ্গে ওর খাতির হয়েছে বেশি। একই স্কুলে পড়ে। বয়সে বড়ো হলেও, লেখাপড়ায় দুজন একই ক্লাসে। মাশুক ভাইয়ের সঙ্গে স্কুলে যায় ও। তবে মাশুক ভাই প্রতিদিন স্কুলে যান না। কোনো কোনো দিন স্কুলে যাওয়ার নাম করে ঘোরাফেরা করেন। এদিক ওদিক। কার গাছের আম বড়ো হয়েছে। কোন বাড়ির লিচু মজা। সব মাশুক ভাইয়ের জানা। কোথায় গাছের গাব পেকেছে? টসটসে পেয়ারা হয়েছে কোন্ বাগানে। এসবও মাশুক ভাইয়ের চেয়ে কেউ ভালো জানে না। কাঁচা আম খাওয়ার জন্য সুন্দর একটা ছুরি বানিয়ে নিয়েছেন মাশুক ভাই। সেই ছুরি খাপঅলা। গাছ থেকে আম পেড়ে, গাছের ডালে বসেই আম কেটে কেটে খান। বাড়ি থেকে লবণ-মরিচ মাখিয়ে নিয়ে যান কাগজে মুড়িয়ে। দু'দিন সুজনকে গাছে তুলেছিলেন। সুজন গাছে উঠতে জানে না। কিন্তু মাশুক ভাইয়ের সঙ্গে থেকে গাছে ওঠাও শিখে গেছে। যদিও মাশুক ভাইয়ের মতো তরতরিয়ে উঠতে পারে না। একদিন তো সুজনের চোখের সামনে একটা নারকেল গাছে উঠে পড়লেন। গাছ থেকে কয়েকটা ডাব পাড়লেন। তারপর গাছতলায় বসে সে ডাবের পানি খেল ওরা দুজন। ডাবের শাঁসও খেয়েছে। ডাবের কচি শাঁস খেতে ওর সময়ই মজা লাগে!

ডাব খেতে খেতে মাশুক ভাই বললেন, 'এটা কার গাছ জানিস?'

'কার?'

'আমার ছোটো ফুফুর।'

কথাটা শুনেই মুচকি হাসল সুজন। বলল, 'আপনার ছোটো ফুফু মানে তো আমার মা।'

'ঠিক ধরেছিস। আমার দাদা, মানে তোর নানাজান এ গাছটা তোর মাকে দিয়েছেন। সবচেয়ে ভালো নারকেল গাছ এটা।'

হাটে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে এসে সুজন তো অবাক! একটা বস্তা ঘাড়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন মাশুক ভাই। অবাক হয়ে সুজন বলল, 'এটা কিসের বস্তা মাশুক ভাই?'

'ধানের।'

'ধান কী হবে?'

'চাল হবে।'

'কীভাবে?'

'চল আমার সঙ্গে। নিজের চোখেই দেখবি।'

ধানের বস্তা নিয়ে তরতরিয়ে হেঁটে চলছেন মাশুক ভাই। পিছন পিছন সুজন। মাশুক ভাইয়ের সঙ্গে ওর পাল্লা দিতেও কষ্ট হচ্ছে।

এগারো

বাড়ি থেকে বেরিয়ে মিনিট দশেক হাঁটল ওরা। হাঁটতে হাঁটতেই চলে এল চালকলে। চালকলে ধানের বস্তা রেখে মাশুক ভাই বললেন, 'হাট থেকে ফেরার পথে নিয়ে যাবো।'

আহ্! বস্তা নেমেছে মাশুক ভাইয়ের ঘাড় থেকে। কিন্তু সুজনের এত স্বস্তি লাগছে যে, মনে হচ্ছে বস্তাটা ওর ঘাড়ে ছিল। সুজন জানতে চাইল, 'এটা কী ধান মাশুক ভাই?'

'কালামানিক। কয়েকদিন ধরে তো কালামানিক চালের

ভাত খাচ্ছিস, বুঝতে পারিস না? ভাতটা কেমন কালা কালা।'

'কিন্তু খেতে মজা।'

'তা মজা। চল তোকে আজ মজার জিনিস খাওয়াবো।'

'কী জিনিস?'

'গজা। খেয়েছিস কখনো?'

'জানি না।'

'জানি না মানে? খেয়েছিস কি না সেটাই জানিস না? এ কী করে সম্ভব?'

'বাবা অনেক কিছু আনেন। সবকিছুর নাম জানি না।'

'জানিস না কেন?'

'জানতে ইচ্ছে করে না।'

'এটা কোনো কথা হলো?'

যেতে যেতে পথে হঠাৎ এক জায়গায় থেমে গেল সুজন। মাশুক ভাইকে দেখিয়ে বলল, 'ওগুলো কী মাশুক ভাই?'

'ধানের চারা।'

'ওরকম কেন?'

'ওটা হলো বীজতলা। ধানক্ষেতে ধানগাছ লাগানোর আগে বীজতলায় চারা গজিয়ে নিতে হয়।'

'সব ধানের?'

'না। আমন আর বোরো ধানের চাষ শুরু হয় বীজতলা থেকে। বীজতলায় চারা গজানোর পর ক্ষেতে লাগাতে হয়।'

'কতদিন পর?'

'পনেরদিন থেকে দেড়মাস। একেক ধানের জন্য একেক সময়। কাল আমরা বীজতলা তৈরি করব। তোকে নিয়ে যাবো।'

বলতে বলতে হাটে চলে আসে দুজন। হাটের মুখেই একটা মিষ্টির দোকানের সামনে থেমে গেলেন মাশুক ভাই। দুটো কী যেন কিনলেন। কাগজে মুড়িয়ে নিলেন। একটা দিলেন সুজনের হাতে। বললেন, 'কামড় দে।'

সুজন কামড় দিল। কামড়ের সঙ্গে সঙ্গে মুড় মুড় করে ভেঙে গেল মুখের ভিতর। সঙ্গে মিষ্টি একটা স্বাদ। নিমকির মতো মড়মুড়ে। কিন্তু জিলাপির মতো মিষ্টি।

এক কামড় খেয়েই সুজন জানতে চাইল, 'এটা কী মাশুক ভাই?'

'এটাই গজা।'

অবাক হলো সুজন। বলল, 'গজা এরকম! মনে হচ্ছে নিমকি।'

'খেতে কেমন সেটা বল।'

'খুব মজা।'

'তাহলে চুপচাপ খা।'

বলেই নিজের গজাটায় তৃতীয় কামড় বসালেন মাশুক ভাই। বিশাল হা মাশুক ভাইয়ের। চার কামড়েই নিজের গজা শেষ করে ফেললেন। শেষ করেই তাকালেন সুজনের গজার দিকে। বললেন, 'এত বড় গজা একা খেতে পারবি তো! খেতে না পারলে বল, আমি সাহায্য করি।'

অন্য কিছু হলে মাশুকভাইকে এ সাহায্যটা করতে দিত সুজন। কিন্তু গজার বেলায় দিল না। গজাটা ভীষণ মজা। কোনো কথাও বলল না। মচ মচ শব্দ তুলে গজা খেতে লাগল।

বারো

মাশুক ভাই বললেন, 'দাদিজান, ওই গল্পটা বলো না!'

'কোনটা?'

'ওই যে ধানের গল্প। কীভাবে ধানচাষ শুরু হলো-সে গল্পটা।'

দাদিজান বললেন, 'ধ্যাৎ! ওইটা এমনি এমনি গল্প। ছোটোবেলায় শুনেছি। সব গল্প সত্যি হয় না।'

'না হোক দাদিজান, তুমি বলো।'

মাশুক ভাইয়ের দাদিজান মানেই সুজনের নানিজান। রসুইঘরে বসে রান্না করছিলেন। বিদ্যুৎ চলে গেছে সন্ধ্যের ঠিক আগে আগে। সারারাত আসবে কি না কে জানে। হারিকেন জ্বালিয়ে বসেছেন। সন্ধ্যের পর বিদ্যুৎ না থাকলে পড়তে ইচ্ছে করে না সুজনের। বসে বসে নানিজানের সঙ্গে গল্প করে। মাঝে মাঝে নানাজানও হাজির হয়ে যান। নানিজানের গল্প শোনেন। নানিজান খুব সুন্দর করে গল্প বলতে পারেন।

বলতে শুরু করলেন নানিজান।

‘অনেক অনেক দিন আগের কথা। কতদিন আগের কেউ জানে না। খুলনা অঞ্চলের কিছু জেলে গেছে ভাটিতে মাছ শিকার করতে।’

‘নানিজান, ভাটি কী?’

নানিজান মুচকি হাসলেন। হারিকেনের আলোয় সে হাসি আরো যেন মধুর লাগল সুজনের কাছে। হঠাৎ নানাজানের গলা শোনা গেল, ‘ভাটা থেকে ভাটি। যে নিচু এলাকায় জোয়ারভাটা হয় সেটাই ভাটি এলাকা।’

চমকে পিছনে তাকাল সুজন। বলল, ‘আরে! নানাজান আপনি কখন এলেন?’

‘কিছুক্ষণ আগে। নানি-নাতি খুব গল্প হচ্ছে। তোদের গল্প শুনতে এলাম।’

নানিজান বললেন, ‘গল্প শুনতে আসছেন নাকি ঘোট পাকাতে আসছেন। সবসময় গল্প বলতে গেলেই আপনি ঝামেলা করেন।’

রেগে গেলেন নানাজান, ‘কী! আমি ঘোট পাকাই? ঝামেলা করি? এরকম কথা তুমি বলতে পারলে? ঠিক আছে। এরপর থেকে বেশি করে ঘোট পাকাব।’

সুজন বলল, ‘নানাজান, ঘোট কি? ওটা কীভাবে পাকায়?’

নানাজান বললেন, ‘তোর নানিজানকে জিজ্ঞেস কর। তোর নানিজান ভালো বলতে পারবে। তোর নানি ভালো পাকাতে পারে। কত মজা করে তরকারি পাকায়, ভাত পাকায়, মাছ পাকায়, সবজি পাকায়। গাছ থেকে পেড়ে ফলও পাকায়।’

নানিজান বললেন, ‘আমি এখন গল্প বলব না।’

নানিজান যখন বলেছেন আর গল্প বলবেন না। তখন আর বলবেনই না। সুজন এতদিনে বুঝে গেছে নানিজানকে। তখনই হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে এল। সুজন বলল, ‘নানিজান মনে হয় আজ আর গল্প বলবেন না। চলেন মাশুক ভাই। কিছুক্ষণ পড়াশোনা করি।’

নানাজানও তাড়া দিলেন, ‘সেটাই ভালো। তোর নানিজানের ঘোট পাকানো গল্পের চেয়ে লেখাপড়া করা অনেক ভালো।’

‘অনেক অনেক দিন আগের কথা। কতদিন আগের কেউ জানে না। খুলনা অঞ্চলের কিছু জেলে গেছে ভাটিতে মাছ শিকার করতে।’

এবারও তেতে উঠলেন নানিজান। ‘কী...!’

মুচকি হেসে রসুইঘর থেকে বেরিয়ে এল সুজন আর মাশুক।

তেরো

পরদিন সকাল সকাল সুজনকে ডেকে তুলল মাশুক ভাই। ‘সুজন, অ্যাই সুজন।’

‘হুঁ।’

‘ওঠ।’

‘আজ তো স্কুল বন্ধ। এত তাড়াতাড়ি?’

‘আজ বীজতলায় যাবো। ধানের বীজ লাগাবো। তুই না দেখতে চেয়েছিস?’

চট করে উঠে গেল সুজন। চটজলদি হাতমুখ ধুয়ে বেরিয়ে পড়তে চেয়েছিল। নানিজান বললেন, ‘উঁহু। না খেয়ে তো বেরুতে দেবো না। কিছু খেয়ে যাও।’

একবাটি মুড়ি আর এক টুকরো গুড় দিলেন সুজনকে। চটপট সেটাই খেয়ে নিল। তারপর বেরিয়ে পড়ল মাশুক ভাইয়ের সঙ্গে। নানাজান অনেক আগে থেকেই বীজতলায় আছেন।

বীজতলার দিকে তাকাল সুজন। ওকে দেখেই নানাজান মুচকি হাসলেন। বললেন, ‘এটা হচ্ছে কাদাময় বীজতলা।’

‘বীজতলা কি শুকনোও হয়?’

‘খুব একটা শুকনো হয় না। তবে এরচেয়ে শুকনোও হয়।’

নানাজানের হাতে দুটো চটের ব্যাগ। সুজন জানতে চাইল, ‘চটের ব্যাগে কী নানাজান?

‘ধানের বীজ। ধানবীজ প্রথমে ২৪ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখতে হয়। তারপর পানি ঝরার জন্য ঘণ্টাখানেক সময় দিতে হয়। পানি ঝরে গেলে বাঁশের টুকরিতে শুকনো খড় বিছিয়ে বীজের পোটলা রেখে দিতে হয়। খুব ভালোভাবে চেপে রাখতে হয়। এটাকে বলে জাগ দেওয়া। এভাবে জাগ দিতে হয় টানা দুই দিন। জাগ দেয়ার পর বীজের অঙ্কুর বেরোয়। আর অঙ্কুর বেরোলেই সে বীজ রোপণের উপযুক্ত হয়।’

কয়েকটা ধানবীজ সুজনের হাতে দিলেন নানা। অবাক হয়ে দেখল সুজন। প্রতিটা ধান থেকে সাদা সাদা কিছু একটা বেরিয়েছে। মনে হচ্ছে ধানের লেজ গজিয়েছে।

বীজতলায় ধানের বীজ ছিটাতে লাগলেন নানাজান। খুব যত্ন করে ছিটালেন। বীজ ছিটানো শেষ করে জমির পাশে বসলেন নানাজান। সুজন জানতে চাইল, 'কতদিন পর চারা গজাবে?'

'চার-পাঁচদিন।'

'চার-পাঁচদিন পরেই ধানগাছ হয়ে যাবে?'
'হ্যাঁ।'

'ওখান থেকেই ধান হবে?'

'নাহ্। এখান থেকে চারা তুলে সারি করে গুছিয়ে জমিতে রোপণ করতে হবে। সেখান থেকে ধান হবে।'

'ওরে বাবা! এত কষ্ট!'

নানাজান ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ধান উৎপাদন অনেক কষ্টের কাজ নানাজান। কৃষকরা খুব দরদ দিয়ে সেই কষ্টটা করেন। ধানের দাম পান না ঠিক মতো। তবু কষ্ট করেন। অনেক সময় জমিতেই ধান নষ্ট হয়ে যায়। কখনো অতিবৃষ্টিতে। কখনো অনাবৃষ্টিতে। যদিও অনাবৃষ্টির কষ্ট আর এখন নেই। ভালো সেচের ব্যবস্থা আছে। ভয় হয় অতিবৃষ্টির জন্য।'

কথা শেষ করে উঠে গেলেন নানা। ওদিকে মাশুক ভাই মশারির মতো জাল নিয়ে এসেছেন। সুজন বলল, 'মশারি দিয়ে কী হবে?'

মাশুক ভাই হেসে বললেন, 'ধানক্ষেতে যাতে মশা ঢুকতে না পারে সেজন্য মশারি টানাবো।'

'ধানক্ষেতেও মশা ঢোকে?'

নানাজান বললেন, 'পাখিরা এসে ধানবীজ খেয়ে ফেলে। যাতে খেতে না পারে, সেজন্য মশারি দিয়ে ঢেকে রাখতে হয়। বুঝলে?'

মাশুক ভাই আর নানাজানের দিকে তাকিয়ে রইল সুজন। দুজনের শরীর বেয়ে টপটপ করে ঘাম পড়ছে। গড়িয়ে গড়িয়ে। তুমুল রোদের মধ্যে শরীর পুড়ে যাচ্ছে। কিন্তু তারা দুজন কাজ করেই যাচ্ছেন। ক্ষেতের পাশে মাথার উপর ছাতা তুলে দিয়ে দেখছে সুজন। এরকম কষ্ট কী ও করতে পারবে?

চৌদ্দ

প্রতিদিন মাশুক ভাইয়ের সঙ্গে বীজতলা থেকে ঘুরে আসে সুজন। বীজতলা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। ছয়দিন পর দেখল, বীজতলা থেকে উঁকি মেরেছে ধানের চারা। আরো দুদিন পর ধূসর বীজতলা সবুজ হয়ে গেছে। ধানের চারা গিজগিজ করছে। ছোটো ছোটো চারা। কী সুন্দর!

ওদিকে নানাজান তখন ধানের জমি তৈরি করতে ব্যস্ত। নানার সঙ্গে কয়েকজন শ্রমিক কাজ করছেন।

কয়েকদিন পর সুজনকে নিয়ে বীজতলায় গেলেন নানাজান। ততদিনে বীজ গজানোর ৫-৬ দিন পেরিয়ে গেছে। গিয়ে দেখল বীজতলায় পানি। পানিতে ঢেকে আছে পুরো বীজতলা।

'এত পানি কেন নানাজান? ধানের চারাগুলো নষ্ট হয়ে যাবে না?'

নানাজান বললেন, 'উঁহু। নষ্ট হবে না। বরং ওরকম পানি না রাখলেই নষ্ট হয়ে যাবে। বীজতলার উপর ২-৩ সেন্টিমিটার পানি রাখতে হয়। তাহলে আগাছা হবে না। পাখিদের উৎপাত থেকেও রেহাই পাওয়া যাবে।'

আরো দুতিন দিন পর মাশুক ভাইয়ের সঙ্গে বীজতলায় গিয়ে তো সুজন অবাক। সবুজ চারাগাছের বেশিরভাগই হলুদ হয়ে গেছে। মাশুক ভাই বললেন, 'গাছগুলো হলুদ হয়ে গেছে, দেখেছিস?'

সুজন জানতে চাইল, 'কেন?'

'পুষ্টির অভাব।'

পুষ্টির অভাব শুনে সুজন হাসল। বলল, 'ধান গাছেরও পুষ্টির অভাব হয়?'

'হয়ই তো!'
'এখন কী করতে হবে?'

'ইউরিয়া সার দিতে হবে।'

পরদিনই জমিতে ইউরিয়া সার দিলেন নানাজান। আরো দুদিন গেল। কিন্তু চারাগাছগুলো তবু সবুজ হলো না। এবার নানাজানের সঙ্গে চারাগাছ দেখতে এসেছে সুজন। সুজন বলল, 'ইউরিয়ার পুষ্টিতেও তো ধানের চারাগুলো সবুজ হলো না নানাজান। এখন কী করতে হবে?'

নানাজান বললেন, ‘এর মানে হচ্ছে গন্ধকের অভাব আছে। এখন জিপসাম সার দিতে হবে।’

কী অবাক! জিপসাম দেয়ার দুদিনের মাথায় চারাগাছগুলো

আবার সবুজ হয়ে গেল। সুন্দর সবুজ। দেখে মন জুড়িয়ে গেল সুজনের।

পনেরো

সুজন হিসাব করে রেখেছে। বীজতলায় চারা গজানোর পর ২৫ দিন পেরিয়ে গেছে। চারাগাছগুলো লক লক করে বেড়ে উঠেছে। একদিন পরেই মাশুক ভাই বললেন, ‘কাল ভোরে বীজতলা থেকে চারা তুলব। যাবি?’

যাব না মানে? অবশ্যই যাব। পরদিন খুব ভোরে ঘুম থেকে জেগে গেল সুজন। এখন অবশ্য ভোরেই ঘুম ভেঙে যায় ওর। ঘুম থেকে উঠে এখানে ওখানে হাঁটাহাঁটি করে। মাশুক ভাই ওকে এ পাড়া ও পাড়া দেখিয়ে নিয়ে আসেন। পাখির কলতান, গাছের পাতায় বাতাসের মর্মর শব্দ-নাকি ছন্দ-দারুণ লাগে ওর।

বীজতলায় এসে আবার অবাক হলো সুজন। বীজতলার মাটি তো আর মাটি নেই। একেবারে থিকথিকে কাদা হয়ে গেছে। ও এসে দেখে নানাজান অনেক আগে

থেকেই কাজ শুরু করে দিয়েছেন। সঙ্গে অবশ্য দুজন শ্রমিক আছেন। ওকে দেখেই নানাজান হাসলেন। বললেন, ‘ঘুম ভাঙল?’

‘হুঁ।’

ঘুম ভাঙলেও ঘুমের রেশটা তখনও কাটেনি সুজনের। পাশেই দুটো বড়ো বড়ো গামলায় পানি রাখা আছে। সুজন জানতে চাইল, ‘পানি দিয়ে কী হবে নানাজান?’

নানাজান বললেন, ‘এখনই দেখতে পাবে।’

একটা দুটো করে অনেকগুলো চারা তোলা হলো মুঠো ভরে। তারপর এক মুঠো চারার গোড়া ওই গামলার পানিতে ধোয়া হলো। নানাজান বললেন, ‘এবার বুঝেছ? চারার গোড়ার মাটি পরিষ্কার করার জন্যই পানি এনেছি।’

চারাগুলো তুলে তুলে সুন্দর করে বাঁধাই করা হতে লাগল। ভিজা খড় দিয়ে একগোছা চারা বাঁধাই করা হয়। তারপর যত্ন করে একটা বাঁশের ঝুঁড়িতে রাখা হলো গোছা গোছা ধানের চারা। নানাজানরা ওই বাঁশের ঝুড়িকে বলেন টুকরি।

কয়েকটা টুকরি দেখতে পেল সুজন। একে একে টুকরিগুলো ভরে গেল। সকাল সকাল বীজতলা আবার ন্যাড়া হয়ে গেল। ধানের চারাগুলো এখন কোথায় যাবে?

নানাজান বললেন, ‘চলো এবার নাশতা খেয়ে আসি।’

সুজন জানতে চাইল, ‘ধানের চারাগুলোর কী হবে?’

এবারও মুচকি হাসলেন নানাজান। বললেন, ‘একটু পর দেখতে পাবে।’

সবাই মিলে নাশতা খেতে এল বাড়িতে। ওদিকে স্কুলের সময় হয়ে যাচ্ছে। মাশুক ভাইকে বলল সুজন,

‘স্কুলের সময় হয়ে যাচ্ছে। যাবেন না মাশুক ভাই?’

‘নাহ্। আজ জমিতে ধান লাগানো হবে।’

‘তাহলে আমিও যাবো না। আমিও ধান লাগাব। আমি কোনোদিন ধান লাগাইনি।’

সুজনের কথাটা শুনতে পেলেন নানাজান। সুজনকে আদর করে কাছে টেনে নিলেন। কপালে চুমু খেয়ে বললেন, ‘আমার নাতিটা দেখি কৃষক হয়ে উঠছে। ধান লাগানোর জন্য স্কুলেও যাচ্ছে না!’

ষোলো

ধানের চারা লাগানোর জমিটাও কাদা কাদা। বিশাল জমি। জমির এ মাথা ও মাথায় দড়ি দিয়ে সারি বানানো হয়েছে। ওই সারি ধরেই চারা লাগানো হবে।

সুজন বলল, ‘নানাজান আমিও ধানের চারা লাগাবো।’

মাশুক ভাই বললেন, ‘উঁহু। তুই পারবি না। তুই বরং বসে বসে দেখ।’

নানাজান বললেন, ‘লাগাক না! শিখিয়ে দিলেই হবে।’

বলেই একটা গোছার বাঁধন খুললেন নানাজান। একবারে তিনটি চারা নিলেন। সেই চারাগুলো কাদামাটিতে পুঁতে দিলেন। বললেন, ‘মাটির একটা নির্দিষ্ট গভীরে চারা রোপণ করতে হয়।’

‘কত গভীরে নানাজান?’

‘দুই থেকে তিন আঙুল সমান গভীর। তবে তোর আঙুলের তিন আঙুল গভীর করে পুঁতবি।’

একটা সারি দেখিয়ে সুজন বলল, ‘এই পুরো সারির চারা আমি লাগাবো নানাজান।’

নানাজান হাসতে হাসতে বললেন, ‘ঠিক আছে। এই সারির সব চারা তুই-ই লাগাস।’

এবার সবাইকে বললেন, ‘শোনো, তোমরা কেউ এই সারিতে চারা লাগাবে না। এই সারির চারা লাগাবে আমাদের নয়া কৃষক। বুঝেছ?’

সবাই হেসে মাথা নাড়ল। দারুণ উৎসাহে চারা লাগাতে শুরু করল সুজন।

প্রথমে ও ভেবেছিল, ধানের চারা লাগানো বুঝি খুব মজার। খুব আনন্দ নিয়ে কাজটা শুরু করেছিল। কিন্তু অর্ধেক সারি লাগানোর আগেই ও বুঝল, এ তো আনন্দ নয় মোটেই। এ ভীষণ কষ্টের। এখন?

নানাজান কিন্তু ওর দিকে তাকিয়ে বুঝে ফেলেছেন বিষয়টা। বললেন, ‘কষ্ট হচ্ছে নানাজান?’

‘না, না নানাজান। একটুও কষ্ট হচ্ছে না।’

‘তবু একটু জিরিয়ে নে।’

বলতে দেরি। কাদামাখা জমি থেকে কোনো রকমে আইলে এসে দাঁড়াল সুজন। দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নিতে লাগল। আর তাকাতে লাগল আশপাশে। আশপাশের প্রায় সব জমিতেই ধান লাগানোর কাজ চলছে।

ভাবতে লাগল সুজন। কারো কোনো অভিযোগ নেই। সবাই যেন রোবটের মতো কাজ করেই চলেছে। একটানা। একই ভঙ্গিতে। নানাবাড়ি না এলে কি এটা ও দেখতে পেত?

সতেরো

প্রতিদিন ধানগাছ দেখতে চলে আসে সুজন। স্কুলে যায় এ পথে। স্কুল থেকেও ফেরে এ পথে। পথটা ঘুরপথ। তবু যেতে যেতে আর আসতে আসতে ধানগাছগুলো তো দেখতে পায়।

প্রায় প্রতিদিনই মা ফোন করেন। বাবা ফোন করেন। মা আর বাবা দুজনই খুব ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন। মায়ের দুশ্চিন্তার শেষ নেই। নানিজানকে পরামর্শ দেন মা। কীভাবে সুজনকে দেখভাল করতে হবে-জানান। নানিজান শোনেন আর হাসেন। কারণ সুজনকে এখন আর দেখাশোনা করতে হয় না। ও নিজের কাজগুলো নিজেই করে। একদিন মাকে জানালেন নানিজান, ‘তুই এত চিন্তা করিস না তো! সুজন ভালো আছে।’

এক রাতে আবার নানিজানের রসুইঘরের আড্ডা জমে ওঠে। আড্ডা জমে উঠতেই সুজন আবদার করে, ‘গল্পটা আবার বলেন না নানিজান।’

নানিজান চোখ কপালে তোলেন। জানতে চাইলেন, ‘কোন গল্পরে চাষার নাতি?’

ইদানীং সুজনকে চাষার নাতি বলে খেপান নানিজান। সুজন রাগ করে না। রাগ করে লাভ নেই। আবার কী বলে বসেন ঠিক নেই। কপট রাগ দেখিয়ে সুজন বলল, ‘আবার!’

‘আবার কী? গল্প?’

সুজন বলল, ‘হুঁ। সেই গল্পটা।’

‘শুরু থেকেই বলব?’

‘এতদিন পরে যখন বললে তো শুরু থেকেই বলতে হবে।’

‘আচ্ছা।’

বলতে শুরু করেন নানিজান।

‘অনেক অনেক দিন আগের কথা। খুলনার কিছু জেলে গিয়েছিল ভাটি এলাকায়। ভাটি এলাকা তো জানিস। সেদিন তোর নানাজান বলেছেন। তো মাছ শিকার করতে গিয়ে কালবৈশাখি ঝড়ের কবলে পড়ে যান তারা। তাদের নৌকা ডুবে যায়। মাছ ধরার জিনিসপত্র হারিয়ে যায়। কোনো রকমে তীরে এসে প্রাণ বাঁচান। ঘন অন্ধকার রাত। কোথায় যাবেন? কিছুই তো দেখা যায় না। রাতটা নদীর তীরেই কাটিয়ে দিলেন কোনো রকমে। ভোর হতেই আর দেরি করলেন না। সূর্যকে ডান দিকে রেখে হাঁটতে শুরু করলেন। সূর্যকে ডানদিকে রেখে হাঁটলে কোনদিকে হাঁটা হয়, বল তো?’

চিন্তা করতে লাগল সুজন। কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, ‘উত্তর দিকে।’

‘ঠিক। উত্তর দিকে হাঁটতে লাগল তারা।’
‘দক্ষিণ দিকে কেন হাঁটল না নানিজান?’

‘দক্ষিণে কীভাবে হাঁটবে? দক্ষিণে তো সাগর। নীল দরিয়া। হাঁটতে হাঁটতে রাস্তা যেন ফুরায় না। সেই ভোর থেকে হাঁটছেই। দুপুরের দিকে আর হাঁটতে পারছিল না। ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় আর ক্লান্তিতে শরীর যেন ভেঙে পড়ছে। আশপাশে যতদূর চোখ যায়, কিছুই চোখে পড়ে না। কোনো জনমানুষ নেই। ঘরবাড়ি নেই। কিছু খাওয়া দরকার। হঠাৎ তারা দেখল নদীতে কিছু মাছ ভেসে এসেছে। ঝড়ের কবলে পড়ে মাছগুলো মরেছে। সেই মাছ ধরল তারা। এখন মাছ খাবে কী করে? কাঁচা মাছ তো খাওয়া যায় না। আশপাশে অনেক খড়কুটো। কিছু খড়কুটো জোগাড় করল তারা। তারপর আগুন জ্বালাল।’

সুজন বলল, ‘আগুন জ্বালাল কীভাবে নানিজান? অনেক অনেক আগে তো লাইটার ছিল না। দিয়াশলাই থাকলেও ঝড়ে বৃষ্টিতে ভিজে গিয়েছে নিশ্চয়ই।’

নানিজান সুজনের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘তুইও তোর নানার মতো। যা, আমি গল্প বলব না।’

‘কিন্তু আমার যে শুনতে ইচ্ছে করছে!’

নানিজান আর কোনো কথা বললেন না। সুজন জানে, নানিজান আর কথাই বলবেন না। অনুরোধ করা বৃথা।

আঠারো

নানাবাড়িতে যে কতদিন হয়ে গেল, টেরই পেল না সুজন। কতদিন হলো? ধ্যাৎ। এসব নিয়ে কে ভাবে? আগে যখন নানাবাড়ি বেড়াতে আসত, তখন দিন গুণত। যদি আরো দুটো দিন বেশি থাকতে পারত! কিন্তু বাবার অফিস। মায়ের ভার্সিটি। ওর স্কুল। বেশি একটা দিনও থাকার উপায় নেই। আর এখন? নানাবাড়িতে ও থাকতেই এসেছে। নানাবাড়ির চারপাশটা এতদিন ঠিকমতো দেখাই হয়নি। এখন দেখছে। যতই দেখছে, ততই অবাক হচ্ছে। এত কিছু আছে নানাবাড়িতে? এতদিন কেন দেখেনি?

নানাজানের ধানক্ষেতটা এখন ওর প্রিয় জায়গা। বয়ে যাওয়া বাতাসে ধানগাছের ঢেউ দেখতে ওর খুব ভালো লাগে। সঙ্গে মিষ্টি একটা গন্ধ ছুটে আসে। আহ! প্রাণভরে নিশ্বাস নেয় সুজন। প্রথম এসে যে ধান গাছগুলো দেখেছিল, এ ধান গাছগুলো দেখতে তারচেয়েও ভালো লাগে। এ ক্ষেতের এক সারি ধানের চারা ও লাগিয়েছে। সেগুলো বড়ো হয়েছে। বাতাসে দুলছে। ভালো না লেগে উপায় আছে?

মাঝে মাঝে ধানক্ষেতে এসেই দেখতে পায়, কেউ না কেউ কাজ করছেন। নানাজান নিজেও কাজ করছেন। আবার কাজের তদারকিও করছেন। ধান গাছের ফাঁকে ফাঁকে অন্য গাছ জন্মায়। এগুলো আগাছা। আগাছা তুলে ফেলতে হয়। নইলে জমির পুষ্টিতে ভাগ বসায়। জমিতে আগাছা থাকলে ধানগাছ হৃষ্টপুষ্ট হয় না। ধানের ফলনও ভালো হয় না।

একদিন মাশুক ভাইয়ের সঙ্গে ধানক্ষেতের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল সুজন। আরে! ওগুলো কী!

জানতে চাইল সুজন, ‘ধান গাছে কি পোকা হয় মাশুক ভাই?’

‘হয়। কত রকম পোকা হয়! মাজরা পোকা, পাতা মোড়ানো পোকা, সবুজ পাতা ফড়িং, বাদামি গাছ ফড়িং, পামড়ি পোকা, গলমাছি, গান্ধী পোকা, লেদা পোকা। পোকা হলে ওষুধ ছিটাতে হয়।’

‘মাশুক ভাই, দেখেন ধানগাছে ছোটো ছোটো ওগুলো কী? ছোটো ছোটো পোকা!

মাশুক ভাই বললেন, ‘ওগুলো ধানের কচি শীষ। সাদা সাদা।’

কিছুদিন পরেই সাদা সাদা শীষ হয়ে যায় একটু বড়ো আর সবুজ। কচি কচি ধানে ভরে যায় ধান গাছগুলো। সবুজ সবুজ ধান। সবুজ ধানেরও দারুণ এক সুবাস পায় সুজন। আরো কিছুদিন পর একদিন নানাজান বললেন, 'এবার তো ধান কাটতে হয়।'

'ধান কাটার সময় হয়ে গেছে নানাজান?'

'হ্যাঁ। ধান তো পাকতে শুরু করেছে।'

'কই, দেখি।'

নানাজান বললেন, 'এই যে দেখ, গোড়ার দিকের ধান হলুদ হয়ে গেছে।'

'কিন্তু উপরের দিকের ধান তো এখনও হলুদ হয়নি।'

'তাতে কি! ধান তো পোক্ত হয়েছে।'

তারও দুদিন পর পুরো ক্ষেতের প্রায় সব ধান হলুদ হয়ে গেছে। নানাজান বললেন, 'নাহ্। আর দেরি করা যায় না। বেশি পেকে গেলে আর ধান তোলা যাবে না। গাছ থেকে ঝরে পড়বে।'

ব্যস। শুরু হয়ে গেল ধান কাটা। পাকা ধানের ম ম সুবাস চারপাশে। সুজনও এসেছে সবার সঙ্গে। ও নিজেও ধান কাটবে। কয়েকগাছি ধান কাটল।

দেখতে দেখতে পুরো ক্ষেতের ধান কাটা শেষ। এবারও অনেকগুলো পাকা ধানের গাছ নিয়ে গোছা বানানো হলো। আর সেই গোছা গোছা ধান নিয়ে রাখল বাড়ির উঠানে। পাকা ধানের গাছের স্তূপ হলো। এবার মাড়াই।

পরদিন ভোরে ধান মাড়াইয়ের একটা যন্ত্র এল। ভোর থেকে শুরু হলো ধান মাড়াই। গাছ থেকে আলাদা হয়ে গেল ধান। আর ধানগাছগুলো আলাদা করে রাখা হলো আরেকটা জায়গায়। মাশুকভাই বললেন, 'ধান গাছ শুকিয়ে খড় হয়, জানিস?'

সুজন বলল, 'জানি। বইয়ে পড়েছি।'

মাশুক ভাই বললেন, 'বইয়ে পড়েছিস। এবার নিজের চোখে দেখ।'

উনিশ

মাড়াই করা ধানেও অনেক খড়কুটো লেগে আছে। নানিজান, মামি আর আরো দুজন মিলে ধান থেকে সে খড় আলাদা করলেন। খড় আলাদা করা দেখতে দারুণ লাগল সুজনের! কুলার মধ্যে ধান নিয়ে উপর থেকে সে ধান ফেলা হচ্ছে। আর বাতাসে খড়কুটো একটু দূরে গিয়ে পড়ছে। বাতাসই ধান থেকে খড়কুটো আলাদা করে দিচ্ছে। একসময় হঠাৎ বাতাস বন্ধ হয়ে গেল। ঘর থেকে বিশাল এক টেবিল ফ্যান নিয়ে এলেন নানাজান। টেবিল ফ্যানের বাতাসে খুব ভালো কাজ হলো।

উঠোন জুড়ে ধান। পাকা ধান। রোদে শুকোচ্ছে ধানগুলো। নানিজান সে ধান পাহারা দিচ্ছেন। লম্বা একটা লাঠি তার হাতে। কোনো পাখি এলেই সে লাঠি দিয়ে তাড়া করছেন। আশপাশ থেকে কিছু হাঁস-মুরগিও ছুটে ছুটে আসে। নানিজান হাঁস-মুরগিও তাড়ান লাঠি হাতে। তিন-চারদিনের কড়া রোদে ধান শুকিয়ে গেল।

সুজন বলল, 'নানিজান, এই ধান থেকেই চাল হবে?'

নানিজান বললেন, 'হবে তো। তবে এখন যে চাল হবে সেটা হলো আতপ চাল। পোলাওয়ের চাল, পিঠে খাওয়ার চাল—সবই আতপ চাল। অনেকে আতপ চালের ভাতও খায়। কিন্তু আমরা ধান সেদ্ধ করব।'

'ধান আবার সেদ্ধ করতে হয় নাকি?'

'হয় তো। আজ রাতেই ধান সেদ্ধ হবে।'

সে রাতে বিশাল বিশাল হাঁড়ি নামানো হলো। সেই হাঁড়িতে ধানের সঙ্গে পানি দিয়ে ধান সেদ্ধ করা হলো। হাঁড়ির পর হাঁড়ি। সেদ্ধ ধান আবার শুকানো হলো রোদে। কড়া রোদে ধান শুকিয়ে কড়কড়া করা হলো। তারপর বস্তায় ভরে রাখা হলো গুদাম ঘরে। আর সেখান থেকে বস্তা বস্তা ধান বের করে চাল কলে নিয়ে ভাঙিয়ে চাল বের করা হয়। ধান থেকে কী করে চাল বের করা হয়, সেটা একদিন দেখেও এসেছে সুজন।

ধান থেকে চাল হওয়ার সময় গুড়ো গুড়ো কী যেন বের হয়। 'মাশুক ভাই ওগুলো কী?'

'কুঁড়ো।'

'কুঁড়ো কি খাওয়া যায়?'

'না।'

'তাহলে ওগুলো নেয়ার কী দরকার ছিল?'

মাশুক ভাই মুচকি হেসে বললেন, 'ওগুলো হাঁসের খাবার। তাছাড়া কুঁড়ো কিন্তু জ্বালানিও।'

মনে পড়ল সুজনের। নানিজানকে প্রায় গুড়ো গুড়ো কী যেন চুলোয় দিতে দেখেন। তাহলে ওগুলোই কুঁড়ো! আর খড় যে গরুর খাবার এটা তো ও জানেই।

এক দুপুরে মাশুক ভাইয়ের সঙ্গে খেতে বসেছে সুজন। হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন ওর দুচোখ চেপে ধরলেন আলতো করে। গায়ের গন্ধটা খুব চেনা। মা নয়তো?

দুচোখ থেকে হাত দুটো সরে যেতেই পিছনে তাকাল সুজন। অবাক হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'মা, তুমি! কখন এসেছ?'

মা বললেন, 'এই মাত্র।'

'তুমি আসবে আমাকে আগে বলো নি কেন?'

'বললে কী হতো?'

হুম। তাই তো! বললে কী হতো? বললে হয়ত বাস স্টপেজে গিয়ে মায়ের জন্য অপেক্ষা করত ও। নানাবাড়ি থেকে বাস স্টপেজ খুব দূরে নয়।

মা অবাক হয়ে সুজনকে দেখছেন। বললেন, 'তোমার গায়ের রং বেশ পোক্ত হয়েছে সুজন।'

'মানে!'

'একটু কালো হয়েছ। আর...বাকিটা পরে বলব। আগে খাওয়া শেষ করে নাও।'

চটপট খেতে লাগল সুজন। কতদিন পর মায়ের সঙ্গে দেখা হলো! কিন্তু মা এত মনোযোগ দিয়ে কী দেখছেন?

সুজনের খাওয়া দেখছিলেন মা। কী সুন্দর করে ভাত খাচ্ছে ছেলেটা। গুছিয়ে গুছিয়ে। থালা থেকে দুটো ভাত ছিটকে পড়েছিল। সে ভাতদুটোও তুলে থালায় নিয়ে নিল। দেখে অবাক হয়ে গেলেন মা। অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন, 'কেমন করে এত সুন্দর করে খাওয়া শিখল ও?'

মা তো আর জানেন না, সুজন অনেক কিছু দেখেছে। ছোট্ট একটা ধান থেকে কী করে চাল হয়—একটা ধানের দীর্ঘ যাত্রাপথ ও নিজের চোখে দেখেছে। এটা দেখে কী করে একটা ভাতও নষ্ট করে ও? সম্ভব?

খাওয়া শেষ করে হাত ধুয়ে মাকে জড়িয়ে ধরল সুজন। আহ্! কতদিন পর মায়ের গায়ের সুবাস পেল। মায়ের ছোঁয়া পেল। মা বললেন, 'দু'মাস আমরা এখানেই থাকব সুজন। ভার্সিটি থেকে ছুটি নিয়েছি। তোমার বাবা কাজ শেষ করে এখানে আসবেন। তারপর আমরা একসঙ্গেই ঢাকায় ফিরব।'

'সত্যি!'

ভীষণ খুশি হলো সুজন। নানাবাড়ির অদ্ভুত এক মায়ায় পড়ে গেছে ও।

হালুম!

নবারুণে হালুম!

সিসিমপুরের হালুমের সাথে আড্ডা হলো নবারুণের। তোমরাও শোনো, কী কথা হলো হালুমের সাথে।

নবারুণ: তুমি কেমন আছ হালুম?

হালুম: হে হে, আমি খুব ভালো আছি, বন্ধু। কারণ আজ সকালে ঘুম ভেঙে দেখি আমার লাগানো ছোট্ট চারাগাছটায় ফুল ফুটেছে! কী যে ভালো লাগছে আমার!

নবারুণ: সিসিমপুরের সব বন্ধুরা কেমন আছে?

হালুম: সবাই অনেক ভালো আছে। ওরা সবাই তোমাদেরকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়েছে। আর তোমরা সিসিমপুরে বেড়াতে এসেছ, তাই তোমাদের ধন্যবাদ জানিয়েছে।

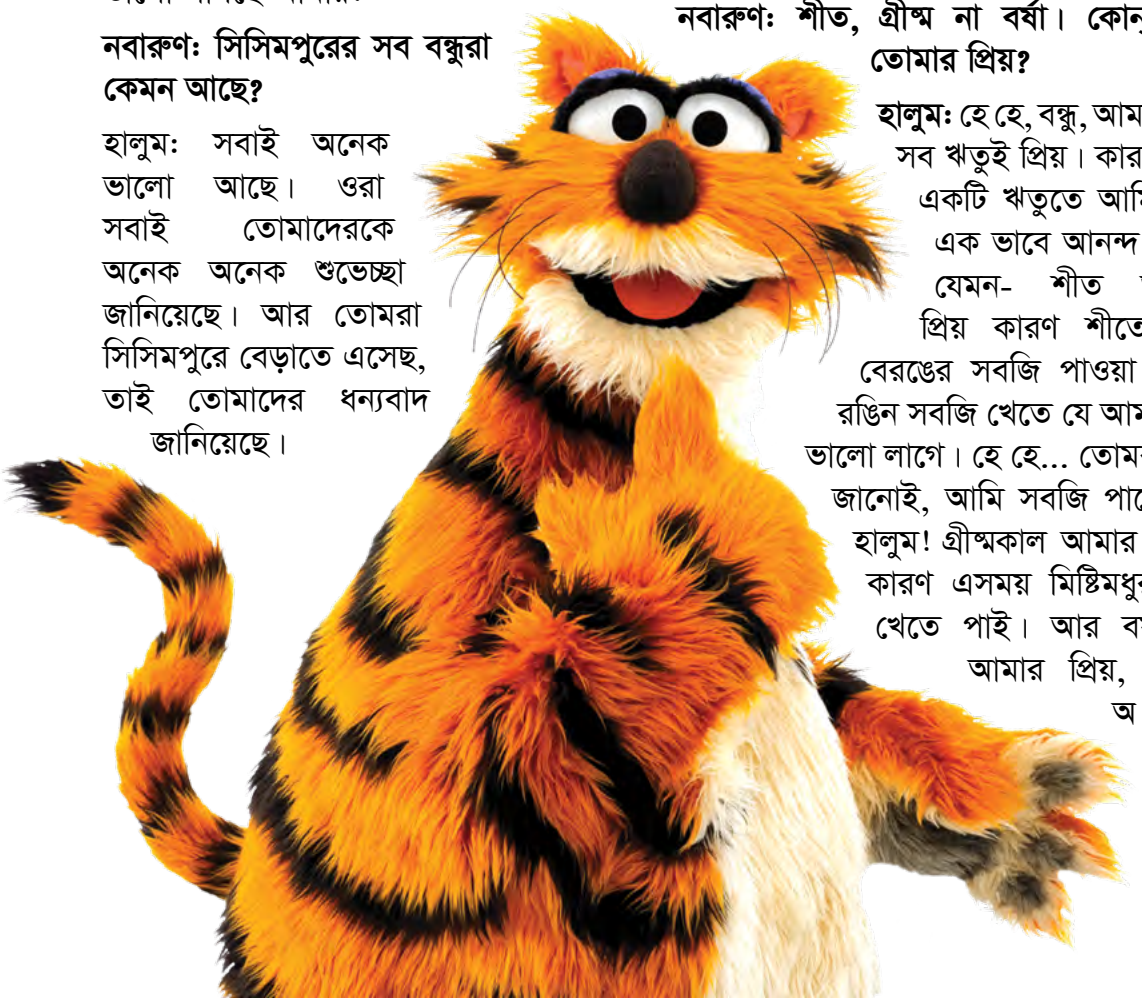

নবারুণ: তুমি কোন্ গানটা গাইতে ভালোবাসো?

হালুম: উহুহুহ, গান তো আমার খুবই প্রিয় একটা জিনিস। আর তাই আমার প্রিয় গানও অনেক। ... কোন্‌টা রেখে যে কোন্‌টা বলি...। তবে এখন মনে পড়ছে, 'এই যে আমার ছোট্ট চারাগাছ' গানটা। তুমি নিশ্চয়ই সিসিমপুরে আমাকে গাইতে শুনেছ গানটা। তাও একবার দু-লাইন গেয়ে শোনাই।

'এই যে আমার ছোট্ট চারাগাছ
আমি একে পানি দেই
সূর্যের আলো খাওয়াই
তারপর ধীরে ধীরে বড়ো হয়।'

নবারুণ: শীত, গ্রীষ্ম না বর্ষা। কোন্ ঋতু তোমার প্রিয়?

হালুম: হে হে, বন্ধু, আমার তো সব ঋতুই প্রিয়। কারণ এক একটি ঋতুতে আমি এক এক ভাবে আনন্দ করি। যেমন- শীত আমার প্রিয় কারণ শীতে রং-বেরঙের সবজি পাওয়া যায়। রঙিন সবজি খেতে যে আমার কী ভালো লাগে। হে হে... তোমরা তো জানোই, আমি সবজি পালোয়ান হালুম! গ্রীষ্মকাল আমার পছন্দ কারণ এসময় মিষ্টিমধুর ফল খেতে পাই। আর বর্ষাকাল আমার প্রিয়, কারণ আমি বৃষ্টির

রিমঝিম শব্দ শুনে শুনে মাছ ধরতে ভালোবাসি। আর সব ঋতুতেই আমি অনেক অনেক খেলাধুলা করি। তাই সব ঋতুই আমার প্রিয়!

নবারুণঃ গাছপালা কমে যাওয়ায় তোমার কী কী অসুবিধা হচ্ছে?

হালুমঃ গাছ তো আমার বন্ধু। গাছ আমাকে সবজি দেয়, ফল দেয়, ফুল দেয়, বিশুদ্ধ বাতাস দেয়। গাছ থাকলে প্রজাপতি বন্ধু আসে, ফড়িং বন্ধু আসে। গাছ কমে গেলে ওরাও আর আসবে না...! হুম আমার মন খারাপ হবে! আর শোনো, আমার প্রিয় বন্ধুরা কিন্তু সবাই গাছ লাগায়, গাছের যত্ন করে।

নবারুণঃ তোমার কী খেতে বেশি পছন্দ?

হালুমঃ সে তো জানো, রঙিন সবজি আর মাছ ভাজা। তবে আমি অন্য সব খাবারই পছন্দ করি, খাইও।

নবারুণঃ তুমি কি সাঁতার জানো?

হালুমঃ হ্যাঁ, জানি তো! সাঁতার আমার খুব প্রিয়! বাহাদুর আর সুমনা আমাকে আর আমার বন্ধু শিকু, টুকটুকি আর ইকরিকে সাঁতার শিখিয়েছে। তবে হ্যাঁ, সাঁতার জানলেও আমি কিন্তু নিরাপত্তা উপকরণ, মানে হলো, লাইফ জ্যাকেট বা বয়া ছাড়া পানিতে নামি না। আর সবসময় দেখি নেই, আশপাশে বড়ো কেউ আছে কিনা।

নবারুণঃ তোমার তো অনেক বন্ধু জানি। তুমি বন্ধুদের কী কী শেখাও বলো তো?

হালুমঃ ঠিক বলেছ, আমার আসলেই অনেক বন্ধু। এই যেমন- টুকটুকি, ইকরি, শিকু, রায়া, শেরালি, বিজলী, মানিক, রতন, গুণিময়রা, আশা, বাহাদুর, সুমনা। বন্ধুদের সাথে আমি অনেক মজা করি। ওদের আমি বর্ণ শেখাই, মজার মজার খেলা শেখাই। আর আমিও ওদের কাছ থেকে প্রতিদিন নতুন নতুন কিছু না কিছু

শিখি। এই যেমন আজ আমি শিখেছি, কী করে কোনো কাজের পরিকল্পনা করতে হয়।

নবারুণঃ ঈদে কী কী করবে তুমি? কোথায় কোথায় বেড়াতে যাবে?

হালুমঃ আহা, ঈদ আসছে। মনটা আনন্দে নেচে উঠছে। ঈদে আমি সিসিমপুরের বন্ধুদের বাড়ি বাড়ি বেড়াতে যাব। পায়েস খাবো, ফিরনি খাবো। বন্ধুরাও আসবে আমার বাড়ি। আর তোমাদের সবাইকে কিন্তু সিসিমপুরের নেমন্তন্ন রইল। ঈদের তিনদিন তো তোমাদের সব বন্ধুদের সাথে আমাদের দেখা হয়ই,কথাও হয়, জানো তো? আরটিভিতে। ঈদের দিন থেকে পরবর্তী তিনটি দিন। সবাই এসো কিন্তু সিসিমপুরে!

নবারুণঃ নবারুণের বন্ধুদের পক্ষ থেকে তোমাকে ঈদ মোবারক। এসো কোলাকুলি করি।

হালুমঃ হে হে হে...

সৌজন্যেঃ সিসেমি ওয়ার্কশপ বাংলাদেশ

পুটু গেল মেলায়

কাজী কেয়া

মা ডান পাশে, আর বাঁ পাশে গোল বালিশটা। মাঝখানে পুটু ঘুমায়। মায়ের হাতে মাথা না রাখলে তার ঘুম আসে না।

ঘুম এমনি আসে না। একটা গল্পই মা শোনায় রোজ। সেই আধহাত মানুষ আর বারোহাত মানুষের গল্প। রোজ রাতেই গল্পটা শোনে পুটু। তারপরও মনে হয় গল্পটা নতুন। অদ্ভুত লোকটা, নামটাও অদ্ভুত। টোটে মোটে টন্টু। এক বিঘেত, মানে আধহাত মানুষ সে। আর লম্বা বারো হাত তার দাঁড়ি। আর দাঁড়িসমেত সাড়ে বারো হাত মানুষটা। দাঁড়ি তো নয়, যেন বেনি বাঁধা চুলের বাহার। টোটে মোটে টন্টু হেঁটে গেলে দাঁড়িটা সারা পথ লুটিয়ে লুটিয়ে যায়। পরিরাজ্যের সবচেয়ে সম্মানীয় ব্যক্তি। পরিরা তাকে টন্টুদাদু বলে ডাকে।

একদিন হলো কী, টন্টুদাদু সাগরের পাড়ে গেল। সাগরতলের নীল চোখের মৎস্যকন্যা– যার নাম আকাশি। মৎস্যকন্যাদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী, তাকে সবাই আদর করে জল কুমারী বলে ডাকে। জল কুমারী ভুশ করে সাগরের তল থেকে মাথা তুলেই টন্টুদাদুকে দেখতে পেল। দেখে তো সে অবাক, সে মানুষ দেখেছে অনেক, কিন্তু এমন ছোট্টখাট্টো অথচ এত্ত বড়ো দাঁড়িঅলা লোক সে কখনো দেখেনি।

তবে ভয় পেল না। ডাকল, ও মানুষ, আজব মানুষ– নাম কী গো তোমার?

টন্টুদাদু তার দিকে তাকিয়ে ফ্যাক করে হেসে দিল।

হাসলো কেন গো?

টন্টুদাদু আবার হাসল। বলল, তোমার সাহস দেখে হাসছি। আমাকে এমনভাবে প্রশ্ন করছ, যেন আমি তোমার কাছে অতি সামান্য কিছু। বুঝলে হে মেয়ে আমি হচ্ছি- টোটে মোটে টন্টু। পরিরাজ্যের সর্বজন শ্রদ্ধেয় মুরুব্বি। আমার বয়স কত জানো হে! দশ হাজার একশ একানব্বই বছর। আর ইচ্ছে করলে আমি এই জাদুর দাঁড়ি দিয়ে পুরো সাগরের পানি শুষে নিতে পারি!...

মৎস্যকন্যা আকাশি ভয় পেয়ে ভুশ করে ডুব দিয়ে সাগররাজ্যে তলিয়ে গেল।

তারপর...?

এ পর্যন্তই। গল্পটা এটুকু বলতেই পুটু রোজ ঘুমিয়ে পড়ে। পুটুর আর কখনোই গল্পের বাকি অংশ শোনা হয় না।

পুটুর বয়স এখন সারে চার বছরও হয়নি। একটু বুদ্ধিজ্ঞান হয়েছে, তাই সে কদিন ধরে রোজ বায়না ধরছে– এবার পহেলা বৈশাখে মামার সঙ্গে দৈদির মেলায় যাবে। পাড়ার ছেলেমেয়েরা ওদের বাড়িতে আসে প্রায়। তারা গল্প করে, দৈদির বৈশাখি মেলায় অনেক মজা আছে। প্যাঁপু বাঁশি, নাগরদোলা, আরো কত কিছু! ওরা দৈদির মেলায় যাবে এবার। পুটুও মায়ের আঁচল চিবাতে চিবাতে মেলায় যাবার আবদার করে।

দু-দিন, তিন দিন, চার দিন। একই রকম আবদার। মা, শেষমেষ কথা দিয়েছে– ঠিক আছে যাবে। তবে মামার আঙুল ছাড়বে না কিন্তু! মেলায় খুব ভিড় হয়। বাচ্চারা হারিয়ে যায়। ভীষণ ভয় হয় আমার। মামাকে মা বুম্বা বলে ডাকে। নাম হলো মোবাশ্বের, মোবাশ্বের কী করে যে বুম্বা হয়ে গেল তা পুটুও জানে না। তবে মামার শরীর মোটাসোটা ধরনের। আর ভারি অলস। একটু কোথাও বসলেই চোখ জুড়ে ঘুম নামে। ঘুমালেই বুমবুম করে নাক ডাকা শুরু হয়। এজন্য বোধ হয় মা মামাকে বুম্বা বলে ডাকে। হয়ত তাই হবে।

তা পুটুর মনে ভারি আনন্দ। রাত পোহালেই কাল দৈদির মেলায় যাবে মামার সঙ্গে। মনের আনন্দে তাই রাতে মায়ের হাতে মাথা রাখল না। মাকে গল্প বলারও আবদার করল না। সারাদিন খাটাখাটি করায় মায়ের চোখে ঘুম নেমে এল। পুটু না ঘুমিয়ে মাথার কাছের জানালার ফাঁক দিয়ে রাত দেখতে লাগল। নিঝুম রাত। সুনসান চারদিক। ঝিনঝিন ঝিঁঝির গান। ঝিকিমিকি জোনাক জ্বলা। হঠাৎ হুমহুম করে হুতুম-প্যাঁচা ডাকল। পুটু ভয় পেল না। মনে আনন্দ থাকলে কোনো কিছুতেই ভয় থাকে না। রাত এক প্রহর চলে গেল। দুই প্রহর গেল। তারপরও পুটুর ঘুম এল না। দেখল আকাশটা কেমন সাদা সাদা। ভোর ভোর হয়ে আসছে। গোল ঝলমলে চাঁদের পাশে একটা জ্বলজ্বলে তারা। পুটু জানে, মা তাকে বলেছে– ওটা হলো গিয়ে শুকতারা। শুকতারা দেখতে দেখতে এক সময় চাঁদ এবং তারা– দুটোকেই হারিয়ে ফেলল পুটু। মানে ভোর হয়ে গেছে। তাদের লাল মোরগটা গলা টেনে টেনে ডাক দিল। মায়ের ঘুম ভাঙল মোরগের ডাকে। মা চোখ মেলে দেখে পুটু জানালা খুলে বাইরে তাকিয়ে আছে।

'কী হচ্ছে পুটু, ঘুমোসনি বুঝি?'

'আমাল ঘুম পাচ্ছে না।'

'তার মানে?'

'বুম্বা মামাল ছঙ্গে মেলায় যাবো তাই।'

'সে তো দুপুরের পরে যাবি। তা রাতে ঘুমোসনি কেন?'

পুটু মায়ের গলা জড়িয়ে বলল, খুছিতে।

মা হেসে বলল, দস্যি কোথাকার!

পুটু গেল মেলায়। মা বলেছে মামার হাত ছাড়বি না। পুটু মাথা নেড়ে হেসেছে। তা মেলা কি চাট্টিখানি ব্যাপার। ভিড়ে ভিড়ে যাচ্ছেতাই অবস্থা।

বুম্বা মামার আঙুল চেপে ধরে রাখে পুটু। মামা বলে, এই পুটুরে এত চাপিস না।

পুটু তাও চেপে রাখে গায়ের জোরে। তা মেলার ভেতরে যেখানে নাগরদোলা আর পুতুল নাচের প্যান্ডেল, সেখানে আসতেই পুটুর হাতের মুঠো থেকে মামার আঙুল ফসকে গেল। কী করে ফসকালো পুটু ভেবেই পায় না। মামা হারিয়ে গেছে।

এখন উপায়? চার বছর চার মাস আঠারো দিনের পুটু এখন কী করবে? সে তো এই প্রথমবার ঘরের বাইরে

কোথাও ঘুরতে এসেছে। আর দৈদির মেলা বলে কথা। তাদের গ্রামের নাম কাঞ্চনপুর। দৈদি থেকে কাঞ্চনপুর কত মাইল হবে?

ছোট্ট পুটু কাঁদছে না। সে গ্রামের ছেলে হলেও তাদের সাদা-কালো টেলিভিশনে আভতার কার্টুন ছবি দেখে। এই ছবি দেখে দেখে সে ভয়কে জয় করেছে।

সে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, তার কাছেই দেখে একটা লোক মাইকে পুতুলনাচের ঘোষণা দিচ্ছে। পুটু সাহস করে তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। লোকটা তাকাতেই পুটু বলল, মামা, আমার বুম্বামামা হারিয়ে গেছে, আপনি একটু মাইকে বলে দিবেন?

এত হইচইয়ের মধ্যেও ছোট্ট পুটুর মিষ্টি মামা ডাক শুনে সে হেসে বলল, তোমার নাম কী?

পুটু বলল, পুটু।

তো তোমাদের বাড়ি কোন গ্রামে?

পুটু বলল, কাচ্ছনপুল।

'কাচ্ছনপুল মানে, কাঞ্চনপুর তো?'

হ্যাঁ কাচ্ছনপুল।

'বাবার নাম?'

'বাবা চাকলি কলে, শহলে। মায়েল লাম কুলসুম।'

'আচ্ছা তুমি এখানে বসো। আমি তোমার মামাকে ডাকছি।' এই বলে লোকটা মাইকে বলতে থাকে– 'গ্রাম কাঞ্চনপুর। মায়ের নাম কুলসুম। তার নাম পুটু। বয়স চার বছরের মতো। তার মামার নাম বুম্বা।

বুম্বা মামা হারিয়ে গেছে... বুম্বা মামা তুমি যেখানেই হারিয়ে যাও না কেন, যেখানেই থাকো, তাড়াতাড়ি পুতুলনাচের প্যান্ডেলের কাছে চলে আসো। তোমার জন্য অপেক্ষা করছে তোমার ভাগনে পুটু মিয়া...'

বার দশেক এভাবে হাঁকডাক দিলেও লোকটা বুম্বা মামার কোনো খবর পেল না।

শেষমেষ আর কী করা। লোকটা পুটুকে বিনে টিকেটে পুতুলনাচ দেখালো নিজের কাছে রেখে। নিজের পয়সা দিয়ে বেলুন বাঁশি কিনে দিল। এক ঠোঙা গুড়ের জিলাপি কিনে খেতে দিল। এমনি করে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এল।

'এখন কী করা যায় পুটু। তোমার মামাকে তো পাওয়া গেল না!'

পুটু বলল, একটু এদিক-ওদিক খুঁজলে বুম্বা মামাকে পাওয়া যেতে পালে। মামা শুধু ঘুমায়। কোথাও ঘুমায়ে পলল কিনা।

পুটুকে কাঁধে করে মেলার এদিক-ওদিক ঘুরতে থাকে লোকটা। হঠাৎ দেখে অনেক লোকজনের ভিড়। তারা গোল হয়ে দাঁড়িয়ে কী যেন দেখছে। আর কার হাউমাউ কান্নার শব্দ ভেসে আসছে। ভিড় ঠেলে যেতেই দেখে– গোলগাল গোছের একটা লোক। সে কাঁদছে আর বলছে, আমার ভাগনে পুটু হারিয়ে গেছে গো! এখন কী হবে গো! কোথায় পাবো গো!

পুটু তো তাকে দেখেই পুতুলনাচ মামার ঘাড়ে চড়া অবস্থাতেই চিৎকার করে ওঠে, ওই তো আমাল বুম্বা মামা।

সে ঘাড় থেকে এক লাফে নেমেই মামাকে জড়িয়ে ধরে। বুম্বা মামা ভাগনেকে পাওয়ার খুশিতে তাকে চেপে ধরে আরো জোরে কেঁদে ওঠে।

'মামা তুমি হালালে কী করে বলো তো?'

পুটুর কথায় বুম্বা মামা বলে, ভাগনেরে আমি যে কখন হাঁটতে হাঁটতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। যখন ঘুম ভাঙল দেখি আমি ঘাটপাড়ের বটতলায় পড়ে আছি।

'তাই! চলো এবাল বালি যাই।'

'বাবা পুটু, বাড়িতে গিয়ে কিন্তু তোর মাকে ব্যাপারটা বলিস না। তাহলে খুব লজ্জা পাবো।'

'তাই হবে, চলো বালি যাই।'

বুম্বার ঘাড়ে ছোট্ট পুটু। মামাকে বলল, মামা গান গাও। তাহলে তোমাল ঘুম পাবে না।

মামা গান গায়–

পুটু পুটু পুটুরে,
চল আমরা বাড়ি যাই,
বাড়ি গিয়ে ভাত খাই,
খিদেয় পরান যাই যাই...
পুটু আমার পুটুরে
বাসায় গিয়ে খানা খাই।

পুটু হাসে খিক খিক করে। তাকায় পুটপুট করে। বুম্বামামার ঘাড়ের উপর চেপে বাড়ি ফিরছে পুটু। সন্ধ্যা হয় হয় তখন। পুটুর মনে আনন্দ। মা বুঝি দরজায় দাঁড়িয়ে তার অপেক্ষায় আছে...।

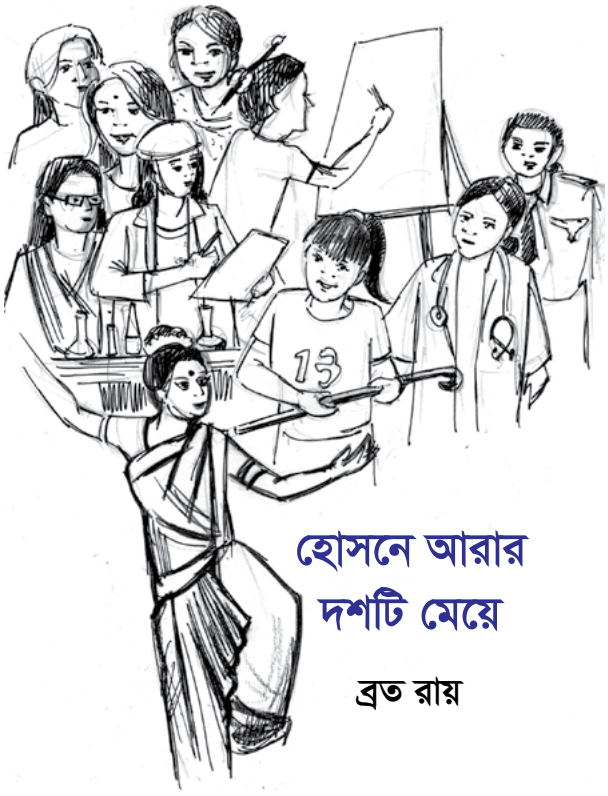

হোসনে আরার দশটি মেয়ে

ব্রত রায়

হোসনে আরার দশটি মেয়ে; সবাই 'ভালো' কয়
একটি হলো প্রকৌশলী, আর যে বাকি নয় -
তাদের ভেতর একটি মেয়ে কাঁপায় খেলার মাঠ
কত পদক আনল জিতে! আর যে বাকি আট -
তার ভেতরে একটি মেয়ের আঁকায় দারুণ হাত
দেশ-বিদেশে সুনাম কত! আর যে বাকি সাত -
তাদের ভেতর একটি করে দারুণ অভিনয়
পুরস্কারে ঘর ভরা তার। আর যে বাকি ছয় -
একটি হলো নৃত্যে সেরা, দারুণ করে নাচ
তার খ্যাতিও সবখানে আজ। আর যে বাকি পাঁচ -
তাদের ভেতরে একটি আবার নামকরা ডাক্তার
কত রোগীর জীবন বাঁচায়। আর যে বাকি চার -
তার ভেতরে একটি মেয়ে দুস্থকে দেয় ঋণ
সমাজসেবায় সুনাম যে তার। আর যে বাকি তিন -
একটি নাকি বিমান চালায়, চিনিস তাকে তুই?
উড়ে বেড়ায় বিশ্বজুড়ে। আর যে বাকি দুই -
একটি বিরাট বিজ্ঞানী তুই গুগল খুলে দ্যাখ
গবেষণায় সুখ্যাতি তার! আর যে বাকি এক -
এই বয়সেই সে হয়েছে বিরাট সাহিত্যিক
হোসনে আরা গর্ব দেশের এই কথাটি ঠিক!

হোসনে আরার দশটি মেয়ে; তাদের কত দাম
বিশ্বজুড়ে যাক ছড়িয়ে এমন মায়ের নাম।

এলিয়েন

আফরোজা পারভীন

বাড়ির ছাদে বসেছিল লী। কদিন ধরে গভীর চিন্তায় মগ্ন সে। তার ছোটো গবেষণাগারে অনেক পরীক্ষানিরীক্ষা করেছে। কিন্তু তার ভাবনার কোনো সমাধান করতে পারেনি। এমন কোনো উপায় বের করতে পারেনি যা দিয়ে এই গ্যালাক্সির বাইরে অন্য কোনো স্থানে গিয়ে স্বচক্ষে দেখে আসতে পারে সেখানকার বিজ্ঞানের অবস্থা।

এসব ভাবনায় খুবই বিমর্ষ লী। লীর মনে হচ্ছে সমস্ত মেধা শেষ হয়ে গেছে তার। অন্য গ্রহে যাবার আগেই সে মারা যাবে। আর তার মৃতদেহ হাওয়ার সাথে মিশে বাতাসে ঘুরতে থাকবে।

ভাবনা চিন্তার জন্য বাড়ির এই ছাদটা খুবই প্রিয় লীর। এখানে বসে অনেক বড়োসড়ো আবিষ্কারের খসড়া করেছে সে। তাই গভীর কোনো চিন্তায় পড়লে এখানে এসেই বসে।

লী ভাবছে। সময় গড়িয়ে চলেছে। লীর মাথা ভারী হচ্ছে কিন্তু কিছুতেই কোনো সমাধান আসছে না মাথায়। এমন মাথা থাকার দরকার কী যে মাথা দিয়ে কাজ হয় না। লী মাথা ঝাড়া দেয়। তখনই পেছনে যেন কার অস্তিত্ব অনুভব করে। ফিরে তাকিয়ে অবাক হয়ে যায়। পেছনে দাঁড়িয়ে আছে এক অদ্ভুত যন্ত্র। এটা প্লেন নয়, হেলিকপ্টারও নয়, তবে বাতাসে ভাসে এমন কোনো যন্ত্র অবশ্যই। দুটি বিশাল ডানাই তার প্রমাণ। কোনো স্পেসশিপ নয় তো ? লীর মনে রোমাঞ্চ। স্পেসশিপে করে কোনো এলিয়েন আসেনি তো! কী আশ্চর্য বড়োসড়ো একটা যন্ত্রযান এসে থামল কিন্তু সে শব্দ পর্যন্ত পেল না! তার মানে এ যন্ত্রে শব্দ হয় না। অনেক দিনের সাধনায় লীর শ্রবণশক্তি অন্যদের চেয়ে অনেক জোরালো হয়েছে বলে সে অতি মৃদু শব্দ পেয়েছে। অন্যরাও যে কোনো শব্দ পায়নি এটা লী নিশ্চিত।

নিঃশব্দে খুলে যায় যন্ত্রযানের দরজা। ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে এক অদ্ভুত জীব। পশুর মতো চার পা দিয়ে নামে। দেখতে অনেকটা মাকড়সার মতো। ওর মাথায় জোড়া বিশাল এক হেলমেট। হেলমেট খুলে ফেলে আগন্তুক। বেরিয়ে পড়ে চওড়া কপাল। কপালের ঠিক মাঝখানে গোলাকৃতি একটা চোখ। হাইটে বেশ ছোটো। লীর কাঁধ পর্যন্ত হবে। কানে

অ্যান্টেনা যুক্ত একটা গোলাকার বস্তু বসানো। এগিয়ে আসে আগন্তুক। ফ্যাস ফ্যাসে গলায় কথা বলে,

: আমার নাম স্রুরা। তোমাকে দেখে এখানে নামলাম। অবশ্য না নেমেও কোনো উপায় ছিল না। আমার বাহনের জ্বালানি ফুরিয়ে গেছে। আমাকে একটু সাহায্য করবে ?

প্রথম ধাক্কায় অবাক হয়ে যায় লী। ভিনগ্রহের মানুষ পরিষ্কার বাংলায় কথা বলছে। বিস্ময় চেপে রাখতে না পেরে বলে, তুমি আমার ভাষা জানো, কী আশ্চর্য! অবাক হবার কিছু নেই। আমার কানে এই যে একটা যন্ত্র দেখছ এটা একটা ট্রান্সলেটর। এ যন্ত্র সব ভাষা সরাসরি ট্রান্সলেট করে ফেলে। এই যে এখানে একটা সুইচ আছে এটা টিপলেই আমি যে-কোনো গ্রহের, এই গ্যালাক্সির, গ্যালাক্সির বাইরের সব ভাষা বলতেও পারি, বুঝতেও পারি। যাহোক দেবে আমাকে জ্বালানি?

এবার ভালোভাবে যন্ত্রযানের দিকে তাকায় লী। এ ধরনের যন্ত্রই সে দেখেনি কখনো। এর জ্বালানি সে পাবে কোথায় ! তাছাড়া তাদের এ প্লানেটে এ ধরনের যন্ত্র আবিষ্কার তো দূরের কথা, আবিষ্কারের চিন্তাও এখনো করা হয়নি।

:কী জ্বালানি তোমার দরকার ? এসব যন্ত্র তো আমাদের এখানে নেই। এর জ্বালানি পাবো কোথায়?

: খুবই মূল্যবান সে জ্বালানি। নাম পলিমার। প্রচুর ছিল। কিছুটা কৌতূহলে অন্য দিকে চলে যাওয়ায় ফুরিয়ে গেছে।

: পলিমার মানে পলিথিন?

: হ্যাঁ, পলিথিন পুড়িয়ে যে ধোঁয়া হয় সেটা দিয়েই আমার যান চলে।

এলিয়েনকে কিছুক্ষণ দাঁড়াতে বলে নিচে নেমে যায় লী। ফিরে আসে দ্রুত। হাতে প্রচুর পলিথিন। খুব খুশি হয় স্রুরা। পলিথিনগুলো যানের মেশিনে যথাস্থানে রেখে লীর পাশে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে বলে,

: তুমি আমার অনেক বড়ো একটা উপকার করলে। এই প্লানেটের জীবরা দয়ালু। এবার আমি যেতে চাই।

স্রুরা যন্ত্রযানের দরজায় পা রাখে। লী দ্রুত গিয়ে দরজা ধরে দাঁড়ায়।

: একটু থামো। আমার একটা কথা ছিল।

সামান্য থামে লী, তারপরই তড়বড় করে বলে,

: আমি তোমার সাথে যেতে চাই তোমার গ্রহে। কী নাম তোমার গ্রহের?

: এ্যান্ড্রোমিডা। আমি তোমাকে নিয়ে যেতে পারি। কিন্তু সেখানকার বৈজ্ঞানিকেরা বিশেষ করে ড. ফিহা , ড. পোলেয়া কীভাবে নেবেন জানি না। মানে তুমি তো একজন এলিয়েন।

: যা ভাবার ভাববেন। তুমি আমাকে নিয়ে চলো।

যন্ত্রযানে চেপে বসে লী। সে এখন চলছে এ্যান্ড্রোমিডার পথে।

দুই

অ্যান্ড্রোমিডায় নেমে লীর চোখে বিস্ময় ফুটে ওঠে। তৃতীয় নয়ন যেন কী দেখেও দেখে না। অনুভূতির সূক্ষ্ম তন্ত্রীতে কী যেন ধরা পড়েও পড়তে চায় না। তারপর হঠাৎ করেই বুঝতে পারে। কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা ভাব। কেন এমন বুঝতে কিছুটা সময় লাগে লীর। একটু ভেবে বুঝতে পারে আসলে মাথার উপরে আকাশ নেই। তাই চাঁদ সুর্য তারা কিছুই নেই। তাপমাত্রা একেবারেই কম। অদ্ভুত ধরনের কিছু গাছ আছে, পাতা নড়ে না অথচ প্রচুর বাতাস। বাড়িগুলো ছোটো ছোটো ইগলুদের বাড়ির মতো। লী খেয়াল করে দেখে এ প্লানেটের সব কিছুই বৃত্তাকার। মাটি পাথরের মতো শক্ত। রাস্তাঘাট সুন্দর ঝকঝকে, তকতকে। তবে কোনো গাড়ি বা যানবাহনের চিহ্ন চোখে পড়ে না লীর।

লীর যন্ত্রযান যেখানে ল্যান্ড করল তার আশপাশে বেশ কয়েকটা একই ধরনের যান দেখতে পেল লী। স্রুরা যন্ত্র থামিয়ে দরজা খুলে বলল,

: নেমে এসো, আমাকে অনুসরণ করো।

লী নিঃশব্দে স্রুরাকে অনুসরণ করে চলল। তার মনে অপার কৌতূহল। কিন্তু হঠাৎ করে বোধ হয় কিছু জিজ্ঞাসা করা ঠিক হবে না।

পর পর অনেকগুলো বৃত্তাকার দরজা পেরিয়ে একটা বিশাল হলাকৃতির বৃত্তাকার দরজা দিয়ে ঢুকল লী আর স্রুরা। এ ঘরের চেয়ার, টেবিল, দরজা, জানালা আসবাবপত্র সবই বৃত্তাকার। প্রতিটি দরজায় একজন করে পাহারা দিচ্ছে। ওদের দু'হাতে বন্দুক জাতীয় এক ধরনের অস্ত্র। লী কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে বলল,

: তোমাদের পাহারাদারদের হাতের অস্ত্রগুলোর নাম কী?

: অমিক্রন রে গান। ওই অস্ত্র দিয়ে ফায়ার করলে সামনে যা থাকবে তাই ছাই হয়ে যাবে। এখন আর কথা নয়। তোমার যা কিছু জিজ্ঞাসা আছে ড. ফিহা, ড. পোলায়ার কাছে জেনে নিও। এই ঘরেই ওনারা আছেন। ওহ্ ভালো কথা তোমার কি ক্ষুধা পেয়েছে? আমরা ক্ষুধা তৃষ্ণাকে জয় করেছি এক ধরনের ট্যাবলেট দিয়ে। তাই ওসবের কথা, মনে থাকে না। তুমি যদি চাও সে ট্যাবলেট তোমাকে দেওয়া যেতে পারে। নাহলে খাবারও এখানে প্রচুর আছে। বোঝই তো কেউ খায় না যেখানে, সেখানে খাবার তো থাকবেই।

কথা বলতে বলতেই হলরুমের পেছনের দরজা খুলে

ভিনগ্রহের মানুষ পরিষ্কার বাংলায় কথা বলছে। বিস্ময় চেপে রাখতে না পেরে বলে, তুমি আমার ভাষা জানো, কী আশ্চর্য! অবাক হবার কিছু নেই। আমার কানে এই যে একটা যন্ত্র দেখছ এটা একটা ট্রান্সলেটর। এ যন্ত্র সব ভাষা সরাসরি ট্রান্সলেট করে ফেলে।

গেল। একযোগে বেরিয়ে এলেন দুজন মানুষ। লীর মতোই দেখতে। স্রুরা তার ফ্যাস ফ্যাসে কণ্ঠে নিজস্ব ভাষায় কী যেন বলল। ওরা মন দিয়ে শুনল। তবে চোখ লীর মুখে। হাতের ইঙ্গিতে বসতে বলল ওরা।

: তুমি কোন গ্রহ থেকে এসেছ এলিয়েন?

: প্লানেট আর্থ।

: কেমন সে গ্রহ আমাকে একটু বুঝিয়ে বলো।

লী যতটা সম্ভব নিজের গ্রহ সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করল। ওরা মনোযোগ দিয়ে শুনল। তারপর বলল,

: তাহলে তোমার গ্রহ আমার গ্রহের থেকে অন্য রকম। বেশ কৌতূহল বোধ করছি আমরা। যে স্পেসশিপে করে তুমি এখানে এসেছ তোমাদের প্লানেটে এই স্পেসশিপ আছে ?

: এমনটা নেই, বানানোর চেষ্টা হচ্ছে। তবে আমরা বানাচ্ছি অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে। তোমাদের গ্রহের সাথে আমার গ্রহের আরো অনেক অমিল আছে। তোমাদের এখানে আকাশ নেই। অথচ মাথার উপরটা লালচে। চাঁদ সূর্য কিছুই নেই অথচ সব সময় ঝকঝকে আলো। দিনরাতের প্রভেদ বোঝা যায় না। আমাদের আকাশ আছে। আকাশটা নীল। সেখানে দিনরাতের প্রভেদ বোঝা যায়। দিনের জন্য আলো আর রাতে আঁধার। অবশ্য চাঁদনি রাতের কথা আলাদা।

: ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। আমাদের আকাশ আছে তবে সেটা অনেক দূরে। কোটি কোটি আলোকবর্ষ ঘুরলেও সে আকাশে পৌঁছাতে আরো সময় লাগবে। চাঁদ সূর্যও আছে তবে সেগুলোও অনেক দূরে বলে আলো এসে পৌঁছায় না। তাপমাত্রাও সে কারণে কম। তবে তাতে আমাদের কোনো সমস্যা নেই। আমাদের যন্ত্রই সব নিয়ন্ত্রণ করে। আলোই বলো তাপমাত্রাই বলো আর বাতাসই বলো সব কন্ট্রোলের দায়িত্ব যন্ত্রের।

: স্রুরার কাছে জানলাম তোমরা ক্ষুধা তৃষ্ণাকে জয় করেছ? কিন্তু আমরা তা পারিনি। আমাদের নিয়মিত চাষাবাদ করতে হয়, ফসল ফলাতে হয়। আর সে ফসল প্রসেস করে রেঁধে খেতে হয়। অবশ্য কিছু কিছু জিনিস কাঁচাও খাওয়া যায়।

অবাক হয়ে শুনল ড. ফিহা আর ড. পোলায়া। যেন এমন অদ্ভুত কথা কখনোই শোনেনি।

: শোনো এলিয়েন, তুমি যা বললে এর পুরোটাই সময়ের অপচয়। আমরা রাঁধা, ফসল ফলানো এসব কিছুর মধ্যে নেই। এসব করতে গেলে বিজ্ঞানকে ফাঁকি দেওয়া হয়। বিজ্ঞানের সাধনা করব কখন? ট্যাবলেটই আমাদের ক্ষুধা তৃষ্ণার নিবৃত্তি করে।

: রোগশোক, অসুখবিসুখ হলে তোমরা কী করো?

ওরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকালো। যেন বুঝতে চেষ্টা করল প্রশ্নটা। তারপর নিজেদের মধ্যে কিছুক্ষণ আলোচনা করল। শেষে বলল,

: রোগশোক মানে তুমি কী কোনো দুর্ঘটনার কথা বলছ?

: দুর্ঘটনাও বলতে পারো আবার নাও বলতে পারো। যেমন ধরো কেউ যদি মারা যায়।

হো হো করে হেসে উঠল তিনজন একত্রে।

: না না এখানে মৃত্যুর কোনো ব্যাপার নেই। আমাদের মৃত্যু আমাদের নিজেদের হাতে, যন্ত্রই তা নিয়ন্ত্রণ করে।

: তারপর ধরো প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন্যা, খরা, মহামারি, ঝড়?

: ওসব আমাদের স্পর্শ করে না। গাছগুলো এত ছোটো যে ঝড়ের বাতাস তাদের স্পর্শ করে না। আর বন্যা, খরা? তাপমাত্রা তো খুবই কম তাই খরা হয় না। অটোমেটিক গান দিয়ে পাহাড় উড়িয়ে দিয়েছি। বৃষ্টি নেই, তাই বন্যাও নেই। যাক তুমি আমাদের সম্পর্কে অনেক জানলে এবার আমাদের প্রশ্নের জবাব দাও।

একের পর এক প্রশ্ন করে চলল ড. ফিহা আর পোলায়া। প্রশ্নের অধিকাংশই মনুষ্য দেহ সম্পর্কিত। কথা শেষ করে বলল,

: যাও এবার আরাম করো।

লীকে নিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো স্রুরা। হঠাৎ করেই আবার নিজস্ব ভাষায় কী যেন বলল লীকে। ড. ফিহা ফিরে এসে লীর কাঁধে হাত রেখে আশ্চর্য দৃষ্টিতে লীর সারা শরীর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল। অস্ফুটে স্বরে বলল, আশ্চর্য, প্লানেট আর্থের জীবগুলো এমন কেন, এমন কেন?

তিন

ইতোমধ্যে দু-দিন কেটে গেছে। এর মধ্যে বার চারেক দেখা হয়েছে ড. ফিহা আর পোলায়ার সাথে। দুজনের চোখেই চকচকে দৃষ্টি দেখে সংকুচিত হয়ে পড়েছে লী। লীকে ট্যাবলেট খাইয়ে দিয়েছে স্রুরা। এখন আর ক্ষুধা তৃষ্ণার অনুভূতি নেই। যতটা সম্ভব এই জায়গাটাকে জেনে নেওয়ার চেষ্টা করছে সে। লীর দীর্ঘদিনের ইচ্ছে ছিল গ্যালাক্সির বাইরে অন্য কোনো গ্রহে গিয়ে সেখানকার বিজ্ঞানের অবস্থা জেনে নেওয়া। এখানকার বিজ্ঞানের উজ্জ্বল অবস্থা দেখে মোহিত লী। সে ঠিক করেছে নিজ গ্রহে ফিরে গিয়ে এসব অভিজ্ঞতা কাজে লাগাবে। ইতোমধ্যে ওদের বড়ো ছোটো অনেকগুলো গবেষণাগারও দেখে নিয়েছে লী।

নিজের বৃত্তাকার ঘরটিতে বসে বৃত্তাকার জানালায় চোখ রেখে কোটি কোটি মাইল দূরে দেখতে না পাওয়া বৃত্তাকার আকাশের দিকে তাকিয়ে এসব কথাই ভাবছিল লী। নিঃশব্দে ঘরে ঢোকে স্রুরা। চেয়ার টেনে বসে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বলে,

তোমার জন্য একটা খারাপ খবর আছে। খবরটা তোমাকে আমার জানানোর কথা নয়। কিন্তু তোমার সাথে থেকে থেকে সম্ভবত আমার মধ্যে কিছু ওলটপালট হয়ে গেছে। কেমন যেন একটা ব্যাপার ঘটে তোমার জন্য আমার ভেতরে যা এ গ্রহের অন্য কারো জন্য হয় না। যাহোক তোমাকে ব্যবচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ড. ফিহা আর পোলায়া। তোমাকে ব্যবচ্ছেদ করে তারা দেখবেন আমাদের সাথে তোমাদের গ্রহের মানুষের কী কী জৈবিক পার্থক্য আছে। তোমার শরীর নিয়ে গবেষণা করা হবে। তারা আশা করছেন এটা হবে এমন এক গবেষণা যা গ্যালাক্সিতে বা গ্যালাক্সির বাইরে কেউ কখনো করেনি।

লী শিউরে ওঠে। সে কী ! এখন উপায়। স্রুরার হাত চেপে ধরে লী।

: আমাকে বাঁচাও। আমার এখনো অনেক গবেষণা বাকি। আমি শেষ হয়ে যেতে চাই না। কারো গবেষণাগারের খাদ্য হতে চাই না।

: তা তো বুঝলাম। কিন্তু কীভাবে তুমি বাঁচবে ?

: তুমি আমাকে স্পেসশিপে করে আমার গ্রহে দিয়ে এসো।

: তারপর আমি ফিরলে কী হবে ?

: তোমার ফেরার প্রয়োজন নেই। আমার গ্রহের জীবরা জ্ঞান-বিজ্ঞানে তোমাদের মতো এতটা অ্যাডভান্স হয়নি। তাই এখনো তাদের মধ্যে জীবের প্রতি দয়া ভালোবাসা সবই আছে।

: কিন্তু দরজায় দরজায় অমিক্রন রে গান নিয়ে দাঁড়ানো দারোয়ান। অনেক দূরে স্পেসশিপ। সবচেয়ে বড়ো কথা সবই সেন্ট্রালি কন্ট্রোলড। ওরা জেনে যাবেই। আর জানলে শুধু একটা বোতামে হাত দেবার অপেক্ষা।

: তবু তুমি চেষ্টা করো।

চার

পরদিন আবার ডানা মেলে স্পেসশিপ। এবার ওরা চলেছে প্ল্যানেট এ্যান্ড্রোমিডা থেকে প্লানেট আর্থের পথে।

কিছুটা যাবার পর এ্যান্ড্রোমিডার কন্ট্রোল রুমে টিপ দেওয়া হয় একটা বোতামে। স্পেসশিপটি অণু-পরমাণুতে বিভক্ত হয়ে আকাশে ভাসতে থাকে। আর দুটি জীবদেহের কোনো খণ্ডাংশ এই গ্যালাক্সির কোথাও পড়ে কিনা তা বোঝা যায় না।

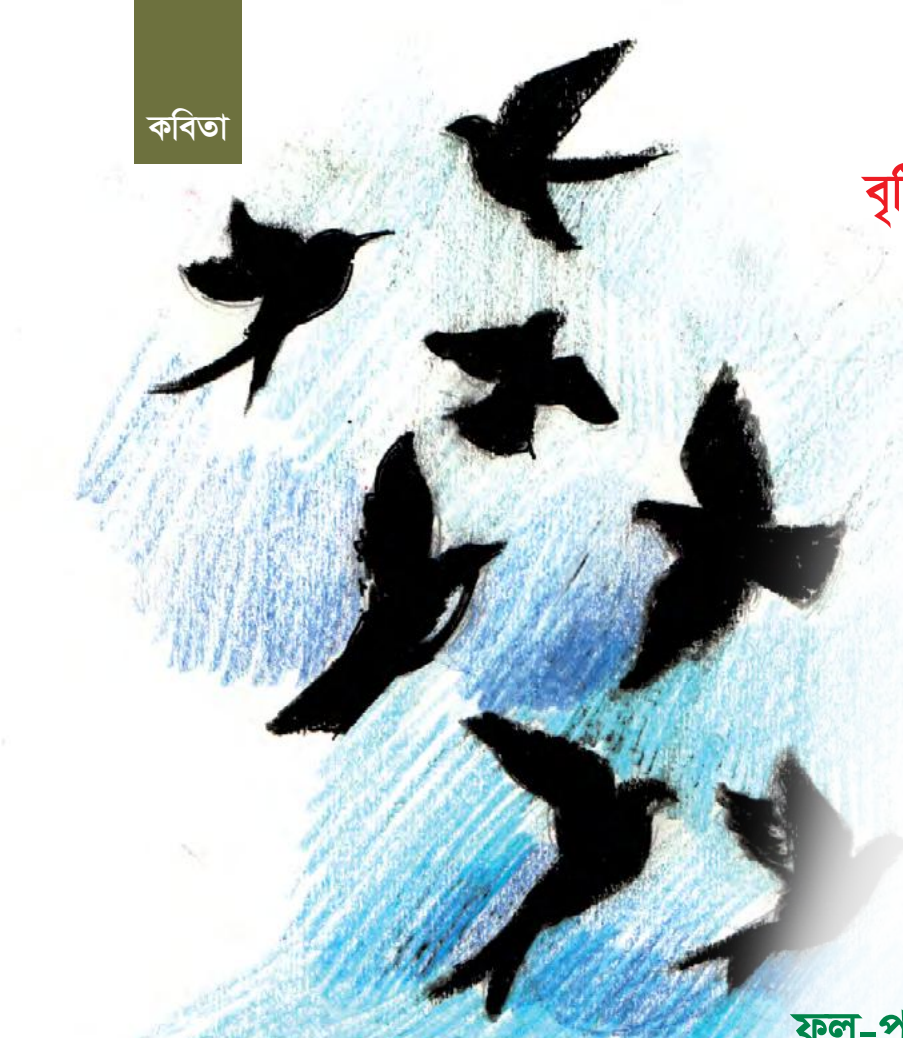

বৃষ্টি পড়ে তিথির বাড়ি

পৃথ্বীশ চক্রবর্ত্তী

মেঘের রথে দিয়ে পাড়ি
আকাশ পথে আড়াআড়ি
বৃষ্টি পড়ে তিথির বাড়ি।

বৃষ্টি পড়ে উঠোন ভরে
কাগজ দিয়ে নৌকা গড়ে
তিথিমণি ফুর্তি করে।

বৃষ্টি পড়ে ঘরের চালে
গাছের পাতায়, ডালে ডালে
তিথি নাচে তালে তালে।

বৃষ্টি পড়ে টাপুরটুপুর
বিকেল-সন্ধ্যা, সকাল-দুপুর
তিথির পায়ে বাজে নূপুর।

ফুল-পাখিদের বন্ধু আমি

শামীম খান যুবরাজ

শিমের গাছে ডিম পেড়েছে একটি ঘুঘু পাখি
সে ডিম ফুটে দুইটি ছানা আজ মেলেছে আঁখি
ভরদুপুরে দেখে এলাম গিয়ে চুপিচুপি
বাসাটা ঠিক উলটে থাকা দাদুর মাথার টুপি।

একটু পরে ঘুঘু এল মুখে নিয়ে খাবার
পালিয়ে এলাম, কাল দুপুরে দেখতে যাবো আবার
ধরব না তো; করব না তো পাখির কোনো ক্ষতি
এই পৃথিবীর শোভা ওরা বড্ড কোমলমতি।

দুষ্টু যারা ধরে পাখি; দেয় বাসাতে হানা
আমার কিন্তু পাখি ধরা এক্কেবারেই মানা
তাদের মতো নইকো আমি দুষ্টু আমি নই
ফুল-পাখিরা জানে তাদের বন্ধু আমি হই।

ঈদ গল্প-৮

শিকল হরিণ

মোজাম্মেল হক নিয়োগী

বারি সাহেব আমার রুমের দরজা পর্যন্ত পা রেখে চকিতেই গেইটের কাছে ফিরে গেলেন। চোখের পলক পড়তে না পড়তেই তিনি একটি ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে ঘূর্ণিবায়ুর মতো রুমের মাঝখানে পাক খেয়ে স্থির হলেন। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, এই যে আপনার পিয়ন। ওকে আজ থেকে নিয়োগ দিলাম। তিনি হাসতে হাসতে বললেন, ওকে কাজে ব্যস্ত রাখবেন। ভয়ঙ্কর দুষ্টু। কাজে ব্যস্ত থাকলে দুষ্টামি করার সুযোগ পাবে না।

আমি ছেলেটির আপাদমস্তক দেখে বললাম, ঠিক আছে ভাই, কোনো সমস্যা হবে না।

বারি সাহেব মুচকি হাসি দিয়ে দ্রুতই আমার রুম থেকে বের হয়ে বাসার ভেতরে গেলেন। হাসিতে বিজয়ানন্দের ঝিলিক। বেশ ফুরফুরে মনে হলো তাকে।

আমি কাজ করি 'শিশু বিকাশালয়' নামে এনজিওতে। আসলে এনজিও নাম দিয়ে তিনি কাজ শুরু করেছেন। নিজের টাকা খরচ করে তিনি বস্তিবাসী শিশুদের জন্য উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার একটি স্কুল দিয়ে শুরু করেছেন এবং অনেক বড়ো এনজিও হবে এমন স্বপ্নে নিজে বিভোর আর আমাকেও মোহমুগ্ধ করে নিয়োগ দিয়েছেন। নিয়োগ বলতে মৌখিকভাবেই, কোনো কাগজপত্র দেওয়া হয়নি। আজকেও যাকে নিয়োগ দেওয়া হলো তাকেও মৌখিকভাবে। প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে মৌখিকভাবেই বিদায় করবেন।

লালমাটিয়াতে বিশাল পৈতৃক বাড়ির নিচ তলায় তিনি থাকেন। বাড়ির অবশিষ্ট তিন তলা ভাড়া দেওয়া। নিজ বাসস্থানের দুটি রুমে অফিস করেছেন। ভেতরে আর চারটি রুমে তাদের থাকার ব্যবস্থা। অফিসের দুটি রুমের একটিতে আমাকে বসতে দিলেন, আরেকটি রুমের দরজায় 'পরিচালকের কক্ষ' নেম প্লেট লাগিয়ে তালাবদ্ধ করে রেখেছেন। কখনো তাকে সেখানে বসতে দেখা যায়নি।

আমার দায়িত্ব হলো বঞ্চিত শিশুদের ওপর গবেষণা করে তাদের উন্নয়নের জন্য প্রকল্প তৈরি করা। আমি ছাড়া এই অফিসে আর কোনো স্টাফ নেই। বস্তির স্কুলটিতে তিন জন শিক্ষিকা আছেন যারা এসএসসি পাসও নয়। তারাই শিশুদেরকে পড়ান। বারি সাহেব কোথায় থাকেন, কী করেন সে সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই। তবে মাঝে মাঝে যখন তিনি আমার সঙ্গে কথা বলেন তখন মনে হয় এটি হবে একটি বড়ো সংস্থা। তখন আমাকে মূল দায়িত্ব দেওয়া হবে। বেতন বাড়ানো হবে দশ গুণ। যদিও এখন যে বেতন দেওয়ার কথা তা ঠিকমতো দেন না। মাসের প্রথম দিকে বেতন দেওয়ার সময় হলেই তিনি ছেলে ভোলানোর গল্প বলে দিন পার করেন। অনেক বৈদেশিক ফান্ড পাবেন। এসব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। অনেক ডোনার তার বন্ধু। সারা বাংলাদেশে শিশুদের জন্য স্কুল করবেন। আরো নানান কথা বলে আমার চোখে স্বপ্নের জাল বুনেন। আর আমিও তখন স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকি। হাত-খরচা বাবদ মাসোহারা কিছু টাকা দেন, যা দিয়ে টানাটানি করে কোনোক্রমে খেয়েপরে চলে। এভাবে আমার ছয় মাস পার হলো।

আমি কী কাজ করব তাও তিনি পরিষ্কার করে বলতে পারেন না। তিনি শুধু বলেন, গবেষণা করেন। কিন্তু গবেষণা করতে যে কত কিছুর প্রয়োজন তা কি তিনি জানেন? কোনো কিছুরই তাল ঠিক না থাকাতে অফিসে একা একা বসে থাকি সারাদিন। নিজেকে কারাবাসী মনে হয়। কর্মহীন কত বসে থাকা যায়? মাঝে মাঝে চোখ ভরে ঘুম আসে। অফিসে ঘুমানো বড়ো অন্যায়। কিন্তু বেশি সতর্ক থাকতে চাইলে ঘুম যেন আরো দ্বিগুণ উৎসাহে ভর করে। আমার নিঃসঙ্গতা কাটানোর জন্যই মূলত একজন পিয়নের কথা বলেছিলাম, আমার অনুরোধেই তিনি এই ছেলেটিকে নিয়ে এলেন আজ।

আমি ছেলেটির দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার নাম কী? চোখ দুটি মেঝেতে স্থির রেখে সে উত্তর দিল, মুহাম্মদ আবুল কাশেম তরফদার।

তোমার বাপ-মা কী বলে ডাকে? আমি জানতে চাইলাম।

মাথাটা আরো নুয়ে পড়েছে কাশেমের। পলেস্টার কাপড়ের একটা আকাশি রঙের হাফ শার্ট গায়ে। প্যান্টটাতে ময়লার পুরুত্বের কারণে কী রং তা আবিষ্কার করা দুসাধ্য। আস্তে আস্তে বলল, আমার বাপ-মা নাই স্যার।

কাশেমের কথাটি শেষ হতে না হতেই বারি সাহেবের স্ত্রী এসে আমার রুমের মাঝখানে দাঁড়ালেন। তিনি হাসতে হাসতে বললেন, ওয়াহিদ সাহেবের পিয়ন নাকি এসেছে? কই?

কাশেম আগের মতোই দাঁড়িয়ে রইল। বারি সাহেবের স্ত্রীর কথা শুনে আমার মনে হলো কাশেম যেন কোনো আজব প্রাণী যাকে খুব আগ্রহ ভরে দেখতে এসেছেন। তিনি কাশেমের দিকে তাকিয়ে বললেন, কী নাম তোমার?

বসের স্ত্রীকে সম্মান করা আমার কর্তব্যজ্ঞান মনে করে চেয়ার ছেড়ে ওনার সামনে এসে দাঁড়ালাম। ছেলেটি উত্তর দিল, মুহাম্মদ আবুল কাশেম তরফদার।

কাশেমের উত্তর শুনে তিনি হাসলেন আর ক্ষীণ স্বরে বললেন, আবার তরফদার!

কর্মচারীদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করা মানুষের সহজাত প্রবণতা। আর আধিপত্য বিস্তারের জন্য জ্ঞানও মাঝে মাঝে দিতে হয়। বারি সাহেবের স্ত্রী হয়ত এজন্যই মাঝে মাঝে আমাকে উপদেশ দিতে আসেন। আজকেও ভুল করলেন না। তিনি বললেন, তরফদারকে নিয়ে আমাদের স্কুলটা চিনিয়ে আসেন। তাহলে সে সময় সময় খবরাখবর আদান-প্রদান করতে পারবে।

আমি একজন অনুগত মানুষের মতো মাথা নেড়ে বললাম, জি ম্যাডাম।

এ রুমে অবস্থান করার মতো আর কোনো কারণ না থাকায় তিনি চলে গেলেন বাসার ভেতরে।

চেয়ারে বসে মাথাটা একটু হেলান দিয়ে কাসেমের দিকে তাকালাম। সে যেন ঠিক দুরন্ত ভাস্কর্যের মতো অনড় দাঁড়িয়ে আছে আমার সামনে। তোমার বাবার নাম কী? আমি জানতে চাইলাম।

সে উত্তর দিল, বাবা নাই।

আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, কে কে আছে তাহলে? কয় ভাই? কয় বোন?

কাশেম উত্তর দিল, আর কেউ নাই স্যার।

তাহলে ঢাকায় এসেছ কার সাথে?

নানার সাথে, সে উত্তর দিল। নানা ইশকুলে গার্ডের চাকরি করেন।

কোন স্কুলে? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

আফনাদের ইশকুলে।

ও! সেই বলো, তুমি রমজান আলীর নাতি? আমি কিছুটা বিস্ময় প্রকাশ করে বললাম। রমজান আলী শিশু বিকাশালয়ের গার্ড। সে নাতির একটা চাকরির জন্য আমাকে কয়েক দিন অনুরোধ করছিল। কিন্তু আমি চাকরি দিতে পারিনি। আমি কী চাকরি দেবো, নিজেই বেতনহীন অফিসে একটা চাকরি জাতীয় কিছু করছি আর আমি দেবো চাকরি! কথায় বলে, 'নিজের শোয়ার নেই জায়গা, ছাগল আনে ভাগা।' আজকেই রমজান আলীর নাতি আমার পিয়ন হয়ে এসেছে, অবাক হলাম বইকি?

স্কুলে পড়তে?

জি স্যার। আফনাদের ইশকুলে ফরতাম। অখন ছাকরি অইছে। একশ ট্যাকা বেতন।

স্কুলে পড়তে দেখিনি তো কোনো দিন? আবার বেতনও আছে তাহলে? আবার একশ টাকা? কম তো নয়। খাওয়া-দাওয়া করবে কোথায়?

নানার সাথে। সেইখানেই থাকি।

বাড়ি কোথায় বললে না তো?

উথলি। ইছামতি নদীর পশ্চিম পাড়ে; সড়কের সাথেই। মেঘলা আকাশে বিদ্যুৎ চমকালে যেমন দেখা যায় ঠিক তেমনি তার মুখে একটি হাসির ঝিলিক বিদ্যুতের মতো আছড়ে পড়ল। সেকি নিজের গ্রামের কথা মনে করেই এমন আনন্দিত হলো।

উথুলি কোথায়?

আরিছা গাঠের কাছে।

বুঝতে পারলাম উথুলি আরিচা ঘাটের কাছেই কোথাও হবে।

বললাম, সেই বলো, বাংলাদেশে কত উথুলিই তো থাকতে পারে। তুমি কি মাঝে মাঝে উথলিয়ে উঠো নাকি?

জি স্যার?

হ্যাঁ!

না স্যার।

বুঝতে পারলাম সে কিছু না বুঝেই জি স্যার, না স্যার উত্তর দিল। এমন আমাকেও মাঝে মাঝে কত ফ্যাসাদে পড়তে হয়। আমার বস কখনো ইংরেজিতে কথা বললে আমি কিছুই না বুঝে ইয়েস, নো বলে চালিয়ে দিই। নিজের সীমাবদ্ধতার কথা ভেবে মনে মনে হাসলাম। একটু নড়েচড়ে বসে গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে ঠিকটাক মতো কাজ করতে পারবে তো?

ন্যুব্জ মাথাটা কিঞ্চিৎ ঋজু করে সে উত্তর দিল, ফারবো স্যার।

ওর কথা শুনে অনুচ্চ স্বরে বললাম, পারবে তো বটে কিন্তু কাজটা কী রে বাপু? তোমাকে কাজ দিতে না পারলে তুমি কী কাজ করবে, হে বালক? আমি নিজেই সারাদিন বসে থাকি। একটা মাছিও পাই না যে ধরে মারব কিংবা ধরার চেষ্টা করব। তোমাকে কী কাজ দেবো তরফদার? কাজ সৃষ্টির জন্য চাই পুঁজি। তিনি বোকার মতো শুধু গপ্পবাজিই করেন। নিজে স্বপ্ন দেখেন। আমাকে স্বপ্ন দেখান। মাঝে মাঝে মনে হয় সারাটা পৃথিবীই আমার পরিচালকের। তিনি এই পৃথিবীর মালিক আর আমি তার গোলাম। কখনও মনে হয় সে আমাকে আকাশ থেকে ঘোড়া এনে দিয়ে বলেন, যান মি. ওয়াহেদ একবার পৃথিবী ভ্রমণ করে আসুন। তখন আমি স্বপ্নে পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াই আর ঘুরে বেড়াই। আমি তার একজন যোগ্য তাবেদার হয়ে তার তাবেদারি করছি। এখন এসে জুটল আর এক তরফদার, তরফদার হে হে ...। শেষের বাক্যটি ছিল উচ্চারিত। তরফদার আমার দিকে চেয়ে রইল। উৎসুক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। মনে মনে বললাম, না রে বালক, তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করব না। এ আমার আপ্ত বাক্যের বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

তরফদার কাজে যোগদান করার সপ্তাহ খানেক পরের কথা। গরমে অস্থির। চেয়ারে বসে কখন যে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। হঠাৎ পায়ের শব্দে চমকে উঠলাম। এ শব্দ স্বয়ং পরিচালকের পায়ের শব্দ। থতমত খেয়ে কোনো মতে নিজেকে সামলিয়ে বসলাম। তরফদারের দিকে একেবারেই খেয়াল ছিল না। আমার বসের ওর দিকেই চোখ পড়ল। এই এই ছেলে ঘুমাচ্ছিস নাকি রে? ওয়াহেদ সাব আপনি দেখছেন না? একে তো আপনি

চালাতে পারবেন না। বারি সাহেব রাগে বিরবির করে বললেন।

কিন্তু তরফদারের সে দিকে খেয়ালই নেই। সে দিব্যি ঘুমুচ্ছে। আমি সিংহের মতো গর্জে উঠলাম। এই ছেলে ঘুমাচ্ছ কেন? হতচকিত হয়ে দাঁড়িয়ে (মুখ থেকে নিঃসরিত লালা মুছতে মুছতে) কোনো কিছু না বুঝেই জবাব দিল, আর ঘুমাব না স্যার। মনে মনে বললাম, তোর বস যখন ঘুমায় তখন তুই কি করবি রে হে বালক?

বারি সাহেব ভীষণ রাগ দেখালেন। এভাবে এনজিও চালানো যাবে না। একটি পিয়ন সে বসে ঘুমায় আর আপনি এখানেই বসে আছেন, অথচ দেখছেন না? আপনি কীভাবে এনজিও চালাবেন?

বলার মতো আমার কিছুই ছিল না। শুধু বললাম, ঠিক হয়ে যাবে।

ঠিক হলেই ভালো। প্রয়োজন হলে অন্য ছেলে নিন।

বারি সাহেব চলে যাওয়ার পর ভাবলাম দুপুরে আর অফিসে বসে থাকব না। একটি কাজ বের করে আমি বারি সাহেবকে বোঝালাম। বললাম, বিভিন্ন অফিসে একটু যোগাযোগ বাড়াতে হবে। তিনিও বললেন, এটা ভালো হবে। তারা কীভাবে বিদেশি ফান্ড জোগাড় করে খোঁজ নিন। আমিও খোঁজ-খবর নিচ্ছি।

আমি একটা ছুতো বের করে দুপুরে কখনো স্কুলে গিয়ে বসে থাকি। মাঝে মাঝে অন্যান্য এনজিও অফিসে যাই, তবে কারো সঙ্গে দেখা করার সুযোগ হয় না; কথা বলা তো অনেক দূরের কথা। পরিচয় না থাকলে যা হয় আরকি- গেটই পার হওয়া যায় না। তবু আমার বন্দি জীবনের অবসান হলো। কাশেম কী করে আমি জানি না। আমি অফিসে যাই ঘণ্টা দুয়েকের জন্য। তারপর বেরিয়ে পড়ি। স্বাধীনতা সত্যি তুমি সুন্দর!

একদিন সারাদিন ঘুরে ফিরে বিকেলে অফিসে গেলাম। বাসার গেটের পাশে তরফদার দেওয়ালের ওপর বসে আছে। আমাকে দেখেই লাফ দিয়ে নেমে এক দৌড়ে অফিসের ভেতরে।

অফিসে গিয়ে চেয়ারে বসলে তরফদার হাসতে হাসতে বলল, স্যারেরা সবাই চিটাগাং গেছে, কাইল আইবো। ওর মসৃণ চুলগুলো বৈদ্যুতিক পাখার বাতাসে উড়ছে। একটি ছেলের চোখে-মুখে লুকিয়ে থাকা সৌন্দর্য যেন বিংশ শতাব্দীর সভ্যতাকে উঁকি মেরে দেখছে। আমি অনেকক্ষণ ওর দিকে চেয়ে থাকাতে সে বিব্রত হলো। ওর চোখে একটা অপরাধের ছায়া জমাট বাধতে শুরু করে। ভাবলাম, হয়ত এ কারণেই দেওয়ালের উপর বসেছিল। নিজেকে সংযত করলাম। এই বয়সে এমন না করলে কখন করবে। ওকে কিছুই বললাম না।

বারি সাহেব খুব সৌখিন মানুষ। বাসার ভেতরের আঙিনায় একটি মিনি চিড়িয়াখানার মতো বানিয়েছেন। একটা হরিণ শিকল দিয়ে বাঁধা। তারের খাঁচার ভেতর তুষারের মতো ধবল দুটি খরগোশ। দরজার কাছে একটি বিশাল অ্যাকুরিয়াম। মাছগুলো দিনের পর দিন সাঁতার কাটতে কাটতে মনে হয় এখন ক্লান্ত। কয়েকটি খাঁচায় বন্দি অনেক পাখি।

আমরা দুজন মৌনতার একটা প্রাচীন গৃহে বন্দি হয়ে গিয়েছিলাম। তরফদারকে দেখলাম জানালা দিয়ে শিকলে বাঁধা হরিণটার দিকে আনমনে তাকিয়ে আছে। অন্যমনস্ক হয়ে সে আমাকে জিজ্ঞেস করল, স্যার হরিণ কোথায় থাকে?

বনে, সুন্দরবনে।

স্যার আপনি ওইখানে গেছেন?

না যাইনি।

রোদে পোড়া দেহটাকে চেয়ারে লাগাতে ভালো লাগছিল না। দরজার পাশে এসে অ্যাকুরিয়ামের

মাছের সাঁতার দেখছি। তরফদার হয়ত বুঝতে পেরেছে আমি রাগ করেছি। হয়ত বা আমাকে খুশি করার জন্যই কাছে থাকতে চাইছে। তাই তো হয়। বসরা অখুশি হলে তাদের কাছে থাকলে তারা খুশি হয়। তাছাড়া আমাদের মধ্যে একটা নিবিড় সম্পর্কও গড়ে উঠেছে বলে অনেক অপ্রয়োজনীয় আলাপ করতে দ্বিধা করে না। সে আবার জানতে চাইল অ্যাকুরিয়ামের মাছগুলো কোথায় থাকে?

পানিতে, আমি জবাব দিলাম।

একটা অস্পষ্ট মিহিন হাসি তার মুখে ছড়িয়ে পড়ল। মনে হলো আমি সঠিক উত্তরটি দিতে পারিনি। তরফদার বলল, ইছামতি নদীতে এমুন মাছ নাই। একটু বাঁকা চোখে ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, ইছামতির সস্তা মাছ দিয়ে এই দামি জিনিসটা নষ্ট করতে যাবে কোন পাগলে?

কাশেম আবার কোথায় যেন হারিয়ে যায়। হয়ত বা তার স্মৃতিময় ইছামতি নদীর গভীরে। ভাবাটাই স্বাভাবিক। না ভাবাটা অস্বাভাবাবিক। মানুষ অতীত অভিজ্ঞতা দিয়ে নতুনকে যাচাই করে। নতুনকে মনে মনে খুঁজে বেড়ায় বিস্মৃতির অতীতে। সে হারানো অতীতের মধ্যে আটকা পড়ে গেছে। ওর চোখ দু'টি ছলছল করছে। ওর ভাবনার দিগন্তে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ইছামতির কথা তোমার মনে আছে?

কাশেম মাথাটা একটু নিচু করে বলল, স্যার, মনে থাকব না! কত মাছ ধরছি। কিন্তুক অ্যাই রকম মাছ দেকি নাই।

আমি অ্যাকোরিয়ামের পাশে মাছের খেলা দেখছি। কাশেম হরিণটার দিকে এগিয়ে গেল। মনে হয় ওর মনে অনেক জিজ্ঞাসা। খরগোশ দু'টি লাফালাফি করছে। ওরা একটু বেশি স্বাধীন। একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, এই মাছ আমাদের দেশে নেই, কোত্থেকে দেখবে?

কাশেম কিছু বলল না। ও শেকলে বাঁধা হরিণটার দিকে তাকিয়েই আছে।

ওরে, এখন ছুটি দিলে কেমন হয় কাশেম?

কাশেম হাসল। এই হাসিতে মুক্তির আনন্দ উদ্ভাসিত। সে খরগোশের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে রুম থেকে বের হয়ে গেল।

ক্যালেন্ডার থেকে গত মাসের পাতাটি ছিঁড়ে দিয়েছিলাম কিছুদিন আগে। এ মাসের মাঝমাঝি দিনগুলোতে আঁকজোখ পড়ছে। পকেটে টাকা না থাকলে হাত পা অবশ হয়ে আসে। এর আগের মাসে অর্ধেক বেতন পেয়েছিলাম। ধারদেনা হয়ে গেছে। আজ অফিস থেকে বের হতে ইচ্ছে হচ্ছে না। বসে বসে পুরনো কিছু কাগজপত্র ছিঁড়ে ঝুড়িটা ভরে দিলাম। দিন গুণে গুণে শেষ করা যায় না। এ মাসের বেতন কখন পাব তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। কত টাকা দেবে তাও জানি না।

পরদিন অফিসে গেলাম সকাল এগারোটায়। টেবিলের উপর অনেকগুলো বকুল ও গোলাপ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। বুঝতে পারলাম কাশেমের কাজ। কিন্তু ওর চেহারায় বিষণ্নতার ছাপ। আমি অফিসে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে বেগম সাহেব আমার সামনে দাঁড়ালেন রুষ্ট মনে। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। তিনি নালিশ করলেন, ছেলেটা গাছে চড়ে। বকুল গাছে চড়েছিল। দেখেন কতগুলি ফুল ছিঁড়েছে।

আমি কাশেমের দিকে তাকালাম। তিনি আবার বললেন, আপনি একে কনট্রোল করতে না পারলে বলেন আজই অন্য কাউকে নিয়ে আসি। আজ বিকালেই আপনার সিদ্ধান্ত জানাবেন।

অপারগ হয়ে কাশেমকে জিজ্ঞেস করলাম, গাছে উঠছিলে কেন?

মেঝের দিকে তাকিয়ে সে মৃদু স্বরে বলল, স্যার আপনাকে ফুল দিতে।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, আমাকে আবার ফুল দিতে হবে কেন? ঠিক আছে আর গাছে উঠবে না। কথ াটা মনে থাকবে তো? শুনতে পেলাম অস্পষ্ট উচ্চারণ, জি স্যার। এ বয়সে গাছে চড়ার আনন্দ আজও খুঁজে বেড়াই হারিয়ে যাওয়া দুরন্ত কৈশোরে। আমিও অনেক গাছে চড়েছি। আমি হতবিহ্বল হয়ে চেয়ারে বসে ভাবছি, হায়রে বিকাশালয়, হে গবেষক ওয়াহেদ আলী আপনার চিন্তা চেতনায় গাছে চড়ার মতো এমন নির্মল আনন্দটুকু কি নিষেধ হয়ে গেল? বিকাশালয়ের কর্মকর্তা হয়ে আজ একটি ছেলের দুরন্তপনাকে করেছি চার দেওয়ালে বন্দি। বিনিময়ে তাকে দেওয়া হচ্ছে মাসে একশত টাকা। তাও এক মাসের টাকা অন্য মাসে। একশ টাকায় কেড়ে নিলাম তার ইছামতি নদী,

ডুব সাঁতারের খেলা, গাছে চড়ার কৈশোরের নির্মল আনন্দ। থাক বাবা আমারও চাকরিটা বাঁচাতে হবে- এসব আমার দেখার বিষয় নয়। আচ্ছাকরে একটা ধমক লাগিয়ে দিলাম কাশেমকে। যে কাশেম দু'ঘণ্টা আগেও আমাকে ফুল দিয়ে দেখতে চেয়েছিল উচ্ছল অনাবিল হাসি সে এখন দেখতে পেল আমার শাসনের ভয়ঙ্কর রূপ। ধমকটি দিয়েছি বটে, কিন্তু অন্তরাত্মায় নিদারুণ কষ্ট অনুভব করতে লাগলাম।

কাশেমকে এখন নতুন কাজ দেওয়া হলো। প্রতিদিন সকালে এসে অফিস ও বাসা ঝেড়ে মুছে ঝকঝকে তকতকে করে রাখতে হবে। চেয়ার-টেবিল ভালো করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। এভাবে কিছুদিন ভালভাবেই চলতে লাগল। সে তার অর্পিত দায়িত্ব পালন করছে কি না সেটা দেখাও আমার দায়িত্ব। কিছুদিন পর লক্ষ করলাম সে কাজ করতে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকে। মাঝে মাঝে হরিণটার দিকে অপলক চেয়ে থাকে। কী যেন ভাবে। একটা তরতাজা মানুষ কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়ছে ধীরে ধীরে। কচি লাউয়ের ডগা কেটে দিলে যেমন ঝিমিয়ে পড়ে ঠিক তেমনি কাশেম ঝিমিয়ে পড়ছে দিনের পর দিন। মাঝে মাঝে সে আমাকে জিজ্ঞেস করে, 'স্যার হরিণটা শিকল দিয়ে বান্দা কেন?'

আমি জবাব দিই পালিয়ে যাবে বলে। এ ছাড়া ওর সঙ্গে আমার আর তেমন কোনো কথা হয় না। কিন্তু এরপরও বেগম সাহেবা প্রায় প্রতিদিনই এসে বলে- ওকে দিয়ে হবে না। ওয়াহেদ সাহেব আপনি ওকে নিয়ে কাজ করতে পারবেন না। আমিও অপারগ হয়ে বিবেকের বিরুদ্ধে ওকে ধমকাই। কিন্তু বিবেক ভালো করেই বুঝে ওর এটা কাজ নয়। যার কাজ তাকেই মানায়, কুমোর কি আর ক্ষুর শানায়? তবুও চাকরিটা ধরে রাখতে হলে বস এবং বসের পরিবারকে খুশি রাখাও কর্তব্য। এ কারণে কাশেমকে অযাচিতভাবে শাসন করি। ধমক দিই। তারপর নিজেই অনুভব করি ভেতরে যেন রক্ত ক্ষরণ হয়।

কাশেম আগের চেয়ে কথা বলা অনেক কমিয়ে দিয়েছে। আগে আমার সঙ্গে সঙ্গে টুকটাক কথা বলত। এখন শুধু আদেশ নিষেধের অপেক্ষায় থাকে। ওর ঝিমিয়ে পড়াটা মাঝে মাঝে আমাকে ভীষণ পীড়া দেয়। প্রায় সময়ই দেখি জানালার গ্রীল ধরে হরিণটার দিকে আপন মনে করুণ চোখে চেয়ে আছে কাশেম। নিবিড় অথচ অবচেতন মনে আমাকে প্রায়ই জিজ্ঞেস করে, স্যার হরিণটা শিকল দিয়ে বান্দা ক্যান? আমিও অন্যমনস্ক হয়ে উত্তর দিই, না-হয় পালিয়ে যাবে যে।

সে আবার জানতে চায়, পালায়ে কই যাইব?

ওর সঙ্গে কথা বলার সময় ওর দিকে তাকাতে ইচ্ছে করে না। অপরাধবোধ ও এক প্রকার কষ্ট আমাকে আড়ষ্ট করে রাখে। অন্যদিকে তাকিয়েই উত্তর দিই, তা কী করে বলব রে কাশেম।

কয়েক দিন এমন নিরানন্দে কাটানোর পর কাশেমকে একটু সহজ করতে চাইলাম। বললাম, কাশেম, তুমি কিন্তু আমাকে আর কোনো দিন ফুল দাওনি?

আমার দিকে তাকিয়ে ও একটু হাসল। বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে সৌন্দর্যকে লালন করার জন্যও মানুষের ভেতর সৌন্দর্য থাকা চাই। মানুষের মন স্বাধীন থাকা চাই। পরাধীনতার শেকলে বাঁধা কাশেমের হৃদয়ের অবোধ পাঁপড়িগুলো সেদিনের ধমকেই ঝরে গেছে। ওর কাছে আমার কিছু চাওয়া নিতান্তই অন্যায় বলে মনে হলো।

রমজান আলী অসুস্থ। সে কিছুদনি যাবৎ ছুটিতে আছে। আমিও চাকরি খুঁজছি পাগলের মতো। আজকে আমার একটি ইন্টারভিউ থাকাতে সকালে অফিসে যাইনি। বিকেলে অফিসে গিয়ে দেখলাম বাড়ির আঙিনায় ছোটো খাটো নেতাদের এক জনসভা পরিমাণ লোক জটলা পাকিয়ে আছে। কী হলো? হঠাৎ বুঝতে পারলাম না। আমাকে দেখেই বারি সাহেব ডেকে ব্যক্তিগত রুমে নিয়ে গেলেন। ওনার চোখে-মুখে অগ্নি স্ফূলিঙ্গ। তিনি বলতে শুরু করলেন, কাশেমটা লুকিয়ে পাশের বাসা থেকে ফুলের টব আনতে গিয়েছিল। তখন সেই বাসার কুকুরটা কামড়ে তছনছ করে দিয়েছে ওকে। ঘটনাটা ঘটেছে মাত্র কয়েক মিনিট আগে। বারি সাহেব তো রেগে আগুন হয়ে গেছে।

এসবের মধ্যেই আমি কাশেমকে নিয়ে হাসপাতালে গেলাম। হাসপাতালের বিড়ম্বনার যে কি তা একবার সেখানে না গেলে বোঝা যায় না বলে বর্ণনা না করাই ভালো।

কয়েক সপ্তাহ চিকিৎসার পর কাশেম কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠেছে। প্রতিদিন একবার করে ওকে দেখতে যাই। রমজান আলীর কোনো খোঁজ খবরও পাচ্ছি না। সে

ছুটি নিয়ে যে গেল আর ফিরে আসার নাম নেই। কাশেম ওর নানার কথা আমার কাছে জানতে চায় কিন্তু এই সেই বলে ওকে প্রবোধ দিই। কীভাবে খবর নেব? গ্রামের বাড়িতে চিঠি পাঠালে হয়ত সাতদিনের আগে পাবে না। তার চেয়ে অপেক্ষা করেই দেখি আসে কিনা?

এই কয়দিনে বারি সাহেব বা ওনার স্ত্রী কেউ একবার কাশেমকে দেখতে গেলেন না হাসপাতালে। একদিন কেবল বারি সাহেব জিজ্ঞেস করেছিলেন, কাশেম বাঁচবে তো?

ওনার কথা শুনে ভীষণ রাগ হয়েছিল আমার। নিজেকে কোনো মতে সংবরণ করে বললাম, বাঁচবে। এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ।

হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আছে কাশেম। রুমে ডেটলের গন্ধ ভুর ভুর করছে। আমি ওর পাশে গিয়ে বসলাম। আমাকে দেখলে ওকে বেশ ফুরফুরে মনে হয়। কাশেমকে জিজ্ঞেস করলাম, কেনো ফুলের টব আনতে গিয়েছিলে?

কাশেমের চোখ দুটি পানিতে ছলছল করে উঠল। সে ভেজা গলায় বলল, স্যার আমি টব আনতে যাই নাই। আমারে স্যারের শ্যালক একটা টব থেইক্যা একটা বড়ো লাল টকটকা গোলাপ ফুল আনতে কইল। বড়ো স্যারেও জানে। আমি ফুল আনতে গেলাম আর কুকুরটা আমারে কামড়াইয়্যা ধরল। কাশেমের চোখের কোন বেয়ে পানি পড়ছে।

ওর কথা শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে পড়লাম। মুখ থেকে রা বের হয়নি। পাথরের মূর্তির মতো বসে রইলাম অনেকক্ষণ। একটা ছবি আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। গোলাপের একটা চারা। একটি মাটির টবের উপর বেড়ে উঠছে। একটি গোলাপ ফুটল। স্যারের শ্যালক বলল, ঐ ফুলটা আনতে পারবা? আর কাশেম বীর পুরুষের মতো দেওয়াল টপকিয়ে লাফিয়ে পড়ল দেওয়ালের ওপাশে। দেওয়ালের ওপাশে দাঁড়িয়েছিল বিদেশি একটি কুকুর। কাশেম ফুলে হাত দিল আর এমনি কুকুরটা কামড়ে ধরল। কামড়াতে কামড়াতে ক্ষত বিক্ষত করে দিল আর স্যারের শ্যালক নিজেকে লুকিয়ে ফেলল। ফুল আনতে গিয়ে হয়ে গেল টব চোর। হঠাৎ কাশেমের কথায় সে ছবিটা চোখের সামনে থেকে সরে গেল।

সে বলল, স্যার ইছামতি নদী ছিনেন?

না।

হরিণটা কি সুন্দর তাই না স্যার?

হ্যাঁ। অনেক সুন্দর।

আমি লক্ষ করলাম কাশেম হাসপাতালের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। আনমনা হয়ে বলল, হরিণটা শুকায়ে যাইতাছে।

আমি কোনো জবাব দিতে পারিনি। শেকলে বাঁধা হরিণটা আমার চোখ দুটিকে আবার আচ্ছন্ন করল।

হাসপাতাল থেকে রিলিজ নিয়ে তরফদারকে নিয়ে অফিসে আসলাম। বারি সাহেব আমাকে ডেকে বললেন, ওকে ওর নানার কাছে দিয়ে আসেন। আর চাকরি করতে হবে না। আমি যখন বারি সাহেবের সঙ্গে কথা বলি তখন দেখলাম তরফদার হরিণটার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। আমি তো আদেশ পালন করার মানুষ মাত্র। তাই কাশেমের জন্য আর কোনো অনুরোধ করলাম না। শুধু বললাম, জি ভাই, এক্ষুণি দিয়ে আসব।

কাশেমের চোখ দুটি ছলছল করছে। তাকে বললাম, তোমাকে আর চাকরি করতে হবে না। চলো তোমাকে তোমার নানার কাছে দিয়ে আসি। তোমার নানা কোথায় থাকে সে জায়গাটা চেনো তো?

সে মাথা নাড়ল, হ্যাঁ।

কাশেম জানালা দিয়ে একবার তাকাল। হরিণটাও ওর দিকে চেয়ে আছে। আমি আস্তে আস্তে বাড়ির আঙিনা থেকে বের হলাম। কাশেমও আমার সঙ্গে বের হলো।

সন্ধ্যার বাতি জ্বলতে আর বেশি দেরি নেই। অনেকগুলো পাখি ঝাঁক বেঁধে আকাশে উড়ছে। যতক্ষণ পাখির ঝাঁক গেল ততক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল কাশেম। তারপর সে আমাকে বলল, স্যার আমি নানার বাসা চিনি। একলা যাইতে পারব। আপনে চলে যান।

ওর সঙ্গে হাঁটতে আমারও ইচ্ছে হচ্ছিল না। আমি রাস্তার পাশে দাঁড়ালাম। কাশেম আস্তে আস্তে হাঁটছে। আমি ওর দিকে চেয়ে রইলাম অপলক দৃষ্টিতে। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। কাশেম হাঁটছে ধীরে ধীরে। কিছুক্ষণ পর অনেক মানুষের ভিড়ে মিশে গেল কাশেম।

জ্যৈষ্ঠ মাসে

মোহাম্মদ আজহারুল হক

জ্যৈষ্ঠ মাসে কাঁঠাল পাকে
আরো পাকে আম
এ মাসেতে লিচু পাকে
আরো পাকে জাম।

এ মাসেতে পাওয়া যায়
মিষ্টি তালের শাঁস
জ্যৈষ্ঠ মাসের ফল খেয়ে
মিটাই মনের আশ।

এ মাসেতে নাইয়র আসে
গাঁয়ের ঘরে ঘরে
মধু মাসের মৌ সুবাসে
সবার মন ভরে।

খোকন, মানুষ তুমি হবে

সোহেল বীর

মনটা আমার ইচ্ছেমতো ঘোরে
ঘুড়ির মতো দূর আকাশে ওড়ে।
ফড়িংরাজা আমার খেলার সাথি
ইচ্ছে হলেই দস্যিপনায় মাতি।

বিকেল হলেই যাই হারিয়ে মাঠে
সন্ধ্যে হলে মন বসে না পাঠে।
মনটা সে তো নেই যে আমার হাতে
চাঁদের কাছে যায় ছুটে যায় রাতে।

রাত্রি হলেই জোনাক পোকার মতো
জ্বাললে আলো কেমন মজা হতো!
কিন্তু কিছুই হয় না মনের মতো
মায়ের কড়া শাসন অবিরত-

মন দিয়ে রোজ পড়াশোনা করো
বড়ো বড়ো বইগুলো সব পড়ো।
পড়লে খোকন মানুষ তুমি হবে
মরেও তুমি অমর হয়ে রবে।

[গত পর্বে আমরা জেনেছি ১৯৭১ সালের মে মাসে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো। এবার জানাব কী ঘটেছিল ১৯৭১ সালের জুন মাসে।]

মুক্তিযুদ্ধের দিনরাত্রি

আবুল কালাম আজাদ

জুন মাসের দিন। বেশ গরম। বাইরে বের হওয়া দায়। বাবা আমাকে ডাকলেন। ফোন রিসিভ করতে বললেন। আমি ফোন রিসিভ করতেই বড়ো চাচার কণ্ঠ। বড়ো চাচা যে সকাল থেকে বাসায় নেই তা মনেই ছিল না। বড়ো চাচা বললেন— শোন, বিকালে আমার তিনজন বন্ধু আসবে। শিলাকে বলো, বসার ঘরটাকে গুছিয়ে রাখতে। তোমার মাকে বলো—কিছু খাবার-দাবার তৈরি করতে।

বড়ো চাচাকে প্রশ্ন করতে ভয় হয়। তবু প্রশ্ন করলাম- কেমন বন্ধু বড়ো চাচা?

বড়ো চাচা ধমক দিলেন না। শান্ত কণ্ঠে বললেন— ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমরা একসাথে যুদ্ধ করেছি। মুক্তিযুদ্ধ। ওরা যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা। ওরা তোমাদেরকে ওদের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকথা শোনাতে আসবে।

আমার মনটা খুশিতে নেচে উঠল। বড়ো চাচা আমাদেরকে মুক্তিযুদ্ধের গল্প শোনানোর প্রজেক্ট হাতে নিয়েছেন। সঙ্গে আছেন তার বাল্যবন্ধু মুহিব চাচা। মার্চ মাসে কী ঘটেছিল, জেনেছি আমরা এবার শুনবো জুন মাসের কথা।

বড়ো চাচা এলেন বিকাল পাঁচটায়। সাথে তার তিনজন বন্ধু যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা।

একজনের নাম সোবহান আহমেদ। তিনি হাঁটেন ক্র্যাচে ভর করে। ডান পা-টা প্রায় অকেজো। আরেকজন মনোয়ার খান। তিনি বাম হাতের কব্জি নাড়াতে পারেন না। আর ফজলুর রহমান। তিনি হুইলচেয়ারে চলেন।

যেহেতু বড়ো চাচার বন্ধু, তারা সবাই আমাদের চাচা।

প্রথমে কথা বলতে মুখ খুললেন সোবহান চাচা। তিনি বললেন, তোমরা ধারাবাহিকভাবে মুক্তিযুদ্ধের গল্প শুনছ। শুনে খুব আনন্দিত হয়েছি। আরো আনন্দিত হয়েছি, তোমাদের এই গল্পের আসরে আসার আমন্ত্রণ পেয়ে। আমরা যুদ্ধ করেছি দেশের জন্য। আমাদের সবার মধ্যেই জমে আছে অনেক গল্প। সেসব শুনিয়ে যাওয়া আমাদের কর্তব্য। এটা জুন মাস। আজ আমরা এসেছি ১৯৭১ সালের জুন মাসের গল্প শোনাতে। এ জন্য আমরা তিনবন্ধু একটু পরামর্শ করে নিয়েছি। আমরা তিনজন ১৯৭১ সালের জুন মাসের ডায়েরি তৈরি করেছি। সে ডায়েরির তিনটি ভাগ আছে। ১. বক্তৃতা ও বিবৃতি। ২. পাকিস্তানি হানাদারদের নৃশংসতা। ৩. মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয়গাথা।

আমি বলব বক্তৃতা ও বিবৃতি। আমার বন্ধু মনোয়ার বলবে পাকিস্তানি হানাদারদের নৃশংসতা। আর বন্ধু বজলু বলবে মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয় গাথা। তোমাদের দুই চাচাকে আজ কিছু বলতে দিব না। তারা আজ শুধুই শ্রোতা।

সোবহান চাচা বললেন, আগে নৃশংসতা দিয়েই শুরু করা যাক। কারণ, পাকিস্তানি হায়েনাদের সব নৃশংসতা, অকথ্য অত্যাচারের পরেই তো এসেছে আমাদের বিজয়।

মনোয়ার চাচা পকেট থেকে একটা কাগজ বের করলেন। বললেন, যেহেতু আমরা দিন-তারিখ উল্লেখ করে বলব তাই লিখে আনতে হয়েছে।

আমরা খুশি হলাম। কোন তারিখে কী ঘটেছিল সেটা জানতে পারার মধ্যে আলাদা আনন্দ।

মনোয়ার চাচা পড়তে লাগলেন—

জুনের ১ তারিখ। পুলিশ ও রাজাকার বাহিনী ঝালকাঠির নলছিটি থানার বিরাট গ্রাম থেকে বরিশাল আদালতের অ্যাডভোকেট জিতেন্দ্রলাল দত্ত, তাঁর ছেলে সাংবাদিক মিহিরলাল দত্ত, সুধীরলাল দত্তসহ হিন্দু সম্প্রদায়ের বহুসংখ্যক লোককে ধরে নিয়ে পাকিস্তানি সেনাদের হাতে তুলে দেয়। তাদের ভাগ্যে কী ঘটেছিল তোমরা তা অনুমান করতে পারছ।

জুনের ৩ তারিখ। বর্বররা সিআই শাহ আলম, ওসি সেকান্দারের নির্দেশে সুধীর দত্তসহ ১১জনকে গোপালগঞ্জ পৌরসভার সামনে নিয়ে গুলি করে হত্যা করে। নিহতদের লাশ নদীতে ফেলে দেয়।

১০ তারিখ। ঘটে এক মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড। স্থান পিরোজপুর। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী মঠবাড়িয়া থেকে ধরে আনে ১০ জন ছাত্র-যুবককে। বলেশ্বর ঘাটে তাদেরকে হত্যা করে। এদের মধ্যে ছিল এসএসসি ও এইচএসসিতে যশোর বোর্ডে প্রথম স্থান অধিকারী ছাত্র গণপতি হালদার। সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন

বিভাগে অধ্যয়নরত ছিল। আর ছিল মঠবাড়িয়া কলেজের ভিপি আনোয়ারুল কাদির।

১৩ জুন। নরপশুদের দ্বারা আরো একটা নির্মম হত্যাযজ্ঞ ঘটে। স্থান সৈয়দপুর। পাকিস্তানি হানাদাররা মাড়োয়ারি ও হিন্দু পরিবারদের ভারতে পৌঁছে দেওয়ার কথা বলে একটি ট্রেনে তোলে। ট্রেনটি সৈয়দপুর রেল কারখানার উত্তর পাশে ফাঁকা জায়গায় পৌঁছুলে দাঁড় করে। ট্রেনের দরজা-জানালা বন্ধ করে দেয়। দুই/তিনজন করে নামিয়ে হানাদাররা গুলি চালায়। পাকিস্তানি বর্বরদের এই পৈচাশিকতায় সেদিন ৩৩৮ জন নিহত হয়।

১৯ জুন। ঢাকার অদূরে জয়দেবপুর। সাধারণ জনতার ওপর পাকিস্তানি বাহিনী আক্রমণ চালায়। ৫০ জন নিরীহ বাঙালি শহিদ হন। জয়দেবপুরে নিরস্ত্র মানুষের ওপর গুলি বর্ষণ ও হত্যার খবর ছড়িয়ে পড়ে। রাজধানী ঢাকা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। হাজার হাজার মানুষ বর্শা-বল্লম নিয়ে পথে নেমে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

এবার সোবহান চাচার পালা। তিনি পড়লেন ১৯৭১ সালের জুন মাসে যেসব গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা, বিবৃতি হয়েছিল সেগুলোর কিছু।

জুন মাসের ২ তারিখ। বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ মুজিবনগরে অল-ইন্ডিয়া রেডিওকে এক সাক্ষাৎকার দেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। বাংলাদেশের জনগণ যে-কোনো মূল্যে এর স্বাধীন অস্তিত্বকে রক্ষা করবে। আমরা বিশ্ববাসীকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিতে চাই, পাকিস্তানি কাঠামো থেকে আমাদের মাতৃভূমিকে পৃথক করার জন্য আমরা মুক্তিযুদ্ধ করছি। এ কাঠামোর অধীনে আপোশ করার কোনো অবকাশ নেই।

৬ জুন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ আটক সব গণপ্রতিনিধির অবিলম্বে মুক্তিদান, বাংলাদেশের মাটি থেকে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠি কর্তৃক অপহৃত ধন-সম্পদ, এবং বিগত আড়াই মাসে হানাদার বাহিনী যে ক্ষতি করেছে, একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে তা নির্ণয় করে লুণ্ঠিত সম্পদ ফেরত ও পূর্ণ ক্ষতিপূরণের মাধ্যমেই কেবল রাজনৈতিক সমাধান আসতে পারে। অন্যথায় কোনো রাজনৈতিক সমাধানের প্রশ্নই আসে না। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ গোঁজামিলের সমাধান মেনে নেবে না।

জুনের ৯ তারিখ। যুক্তরাষ্ট্র সরকার বাংলাদেশের শরণার্থীদের জন্য ভারতকে অতিরিক্ত দেড় কোটি ডলার সাহায্য মঞ্জুর করে।

১৩ জুন। বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের জন্য পৃথিবীর সব রাষ্ট্রের জনগণ ও সরকারের কাছে আবেদন জানিয়ে বলেন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ পৃথিবীর

মানচিত্রে স্থান করে নিয়েছে। সাড়ে সাত কোটি মানুষের ইচ্ছা বাস্তবায়িত হবেই। বাংলাদেশের জনসাধারণের ইচ্ছার ভিত্তিতে গঠিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন সরকারই দেশের একমাত্র বৈধ প্রতিনিধি। পশ্চিম পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসন সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করে আমাদের জনগণ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছে। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশের এই সংগ্রাম রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্যের অবসান ঘটানোর জন্য জনসাধারণের ইচ্ছা থেকে উৎসারিত।

জুনের ৮ তারিখ। ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিতে বাংলাদেশের জনগণের মুক্তি সংগ্রামে নৈতিক সমর্থন ও সহযোগিতার বিষয় অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

১২ জুন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী। তিনি লন্ডনে এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে বলেন, যারা আমাদের শিশু ও নারীদের খুন করছে তাদের আমারা কোনোদিন ক্ষমা করতে পারব না। তাদের অপরাধ ভুলে যেতে পারব না। এই গণহত্যার পর দুই অংশের এক সঙ্গে থাকার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। পূর্ব বাংলার জনগণ এখন একটি মাত্র সমাধান মেনে নিতে পারে, তা হলো- পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য নির্বাচিত প্রতিনিধিকে মুক্তি দান, এবং স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠনের জন্য একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে দেওয়া। বাংলাদেশ হবে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। পাকিস্তানের মতো ধর্মীয় রাষ্ট্র নয়।

২১ জুন। বাংলাদেশ সরকারের অর্থমন্ত্রী এম মনসুর আলী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রদত্ত ভাষণে বলেন, আমাদের এ সংগ্রাম সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রাম। বাঙালির এই অর্থনৈতিক মুক্তির দাবিতে প্রণীত হয়েছিল ছয় দফা কর্মসূচী। এই দফাই আমাদের মুক্তির একমাত্র সনদ।

জুনের ২১ তারিখ। কুখ্যাত রাজাকার গোলাম আযম। সে এবং তার সাঙ্গপাঙ্গরা অপকর্মের সাথে অপকথাও বলতে থাকে। সে বলে, দেশকে খণ্ড-বিখণ্ড হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা ছাড়া আর কোনো বিকল্প ব্যবস্থা ছিল না। বেআইনী আওয়ামী লীগের সাম্প্রতিক গোলযোগ ১৮৫৭ সালে সংঘটিত বাংলার বিদ্রোহ আন্দোলনের চেয়ে ১০ গুণ শক্তিশালী ছিল।

জুনের ২২ তারিখ। বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ পরিষদ সদস্যদের উদ্দেশ্যে ভাষণে বলেন, আমাদের আজ বড়ো লক্ষ্য হবে মাতৃভূমিকে সম্পূর্ণ শত্রুমুক্ত করে আমাদের ৬০ লাখ মানুষকে স্বদেশে ফিরিয়ে আনা। দল-মত নির্বিশেষে আজ বন্ধুরাষ্ট্র ভারতের সব মানুষ বাংলার স্বাধীনতাকামী মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তারা বুকে তুলে নিয়েছেন ৬০ লাখ ছিন্নমূল মানুষ। বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ এই বন্ধুত্বের কথা চিরদিন স্মরণ রাখবে।

২৩ জুন। ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। নয়াদিল্লিতে এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের নেতা। বাংলাদেশ প্রশ্নে রাজনৈতিক মীমাংসার জন্য অন্য কোনো পক্ষের সঙ্গে নয়, তাঁর সঙ্গেই আলোচনা করা উচিত।

২৯ জুন। বাংলাদেশের তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এইচ এম কামরুজ্জামান। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঘোষিত আওয়ামী লীগ দলীয় পরিষদ সদস্যদের আসনে উপনির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখ্যান করে এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, অখণ্ড পাকিস্তান এখন মৃত। ইয়াহিয়া আস্তাকুঁড়ে ঠাঁই নিয়েছে। বাংলাদেশে ইয়াহিয়া খান সবচেয়ে ঘৃণিত ব্যক্তি।

এসব বক্তৃতা বিবৃতি থেকে প্রমাণ হয় স্বাধীন বাংলার সরকার কিছুতেই পাকিস্তানি অপশক্তির সাথে আপোশ করেনি। তারা মুক্তিযোদ্ধাদের পাশে থেকেছে। আন্তর্জাতিক সাপোর্ট এবং সাহায্য পাবার জন্য যা কিছু দরকার তার সবই করেছে।

সবশেষে বজলু চাচার পালা। তিনি বলবেন মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয়গাথা। জুনের ১ তারিখ। মুক্তিযোদ্ধাদের তীব্র আক্রমণের মুখে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কুমিল্লার মন্দভাগ ও শালদা নদী এলাকার স্থান পরিত্যাগ করে। নয়নপুর রেল স্টেশনের কাছে তাদের নতুন ঘাঁটি স্থাপন করে। গোপালগঞ্জের রাজপুরে স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করা হয় জুনের ১ তারিখেই। দেশের এ অঞ্চলের মধ্যে রাজপুরই সর্বপ্রথম মুক্তাঞ্চল হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

জুনের ৩ তারিখ। পুলিশ, রাজাকার ও পাকিস্তানি সেনাসহ প্রায় ৩০০ সদস্যের পাকিস্তানি বাহিনীর একটি দল ১২টি নৌকাযোগে কোটালীপাড়া ও পয়সারহাটের খাল দিয়ে গোপালগঞ্জ মুক্তিবাহিনীর ঘাঁটি আক্রমণে এগিয়ে আসে। পথে হেমায়েত বাহিনী খালের দুই পাশ থেকে পাকিস্তানি বাহিনীর ওপর

অতর্কিত আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণে পাকিস্তানি বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। ২৫ জন রাজাকার পুলিশ মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে ধরা পড়ে। তবে হেমায়েত বাহিনীর বীরযোদ্ধা ইব্রাহিম শহিদ হন।

জুনের ৬ তারিখ। মুক্তিবাহিনী লাকসাম-নোয়াখালী মহাসড়কের খিলাতে পাকিস্তানি বাহিনীর দু'টি জিপ ও একটি ট্রাক অ্যাম্বুশ করে। এতে পাকিস্তানি বাহিনীর চারজন অফিসার ও সাতজন সেনা নিহত ও তিনটি গাড়ি ধ্বংস হয়।

১৫ জুন। সিলেট শাহজিবাজার। রেলসেতুতে মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনা বোঝাই একটি ট্রেনকে অ্যাম্বুশ করে। এতে ১৫০ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত ও ট্রেনটি ধ্বংস হয়।

জুন-৬। চট্টগ্রামে মুক্তিবাহিনীর চাঁদাগাজী ঘাঁটির ওপর পাকিস্তানি বাহিনীর দুটি কোম্পানি আক্রমণ চালায়। মুক্তিযোদ্ধারাও পালটা আক্রমণ করে। দুই ঘণ্টাব্যাপী ব্যাপক সংঘর্ষে ৭৫ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয় এবং আহত হয় আরো অনেকে। চরম ক্ষতি স্বীকার করে তারা ছাগলনাইয়ার দিকে পালিয়ে যায়।

জুন-১২। টাঙ্গাইলে কালিহাতীর বল্লায় কাদেরিয়া বাহিনীর সঙ্গে পাক হানাদার বাহিনীর তুমুল সংঘর্ষ হয়। এতে চার পাকিস্তানি সেনা নিহত হয় এবং পাকিস্তানি বাহিনী পিছু হটে।

জুন-২৫। ময়মনসিংহের ভালুকায় ভাওয়ালীয়া রাজুঘাটে আফসার উদ্দিনের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে পাক বাহিনীর একটানা ৪২ ঘণ্টা যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে পাক বাহিনীর ১২৫ জন সেনা নিহত হয়।

বজলু চাচা বললেন, এ থেকেই তোমরা বুঝতে পারছ যে, জুন থেকেই বাঙালিরা স্বাধীনতার পথে এগিয়ে যাচ্ছে। আর পাকিস্তানি হানাদাররা এগিয়ে যাচ্ছে পরাজয়ের দিকে। মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যাপারে পাকিস্তানিদের তখন কেমন মনোভাব তা আরো বোঝা যাবে চরমপত্রের এইটুকু থেকে-

চাইর মাস ধইরা পাইট করনের পর হানাদার সোলজাররা তাগো কমান্ডারগো জিগাইছে, মুক্তিবাহিনীর বিচ্ছুগুলা দ্যাখ্‌তে কী রকম? এই বিচ্ছুগুলা কী রকমের কাপড় পেন্‌দে? এইসব না জানলে কাগো লগে পাইট করুম? আর দুশমনগো খালি চোখে দ্যাখ্‌তে পাই না ক্যান?

আমরা হেসে উঠলাম। চরমপত্রের যে-কোনো একটু পড়লে বা শুনলেই হেসে ফেলতে হয়। হাসলেও বুঝতে পারি, বিচ্ছুরা সত্যিই কতটা অপ্রতিরোধ্য ছিলেন।

কবিতাটি আবার পড়ো

টাকার মধ্যে এই ছবিটা কার?

লুৎফর রহমান রিটন

খোকা : আচ্ছা মাগো টাকার মধ্যে এই ছবিটা কার?
কোন্ সিনেমার নায়ক তিনি দেখতে চমৎকার !
মা: ওরে খোকা চিনিস না তুই ছবির মানুষটাকে?
লেখক কবি শিল্পীরা তার কত্ত ছবি আঁকে!
অভিনেতা নন তিনি ছিলেন নেতা,
তাঁর কারণেই একাত্তরে যুদ্ধে হলো জেতা।
নায়ক তিনি রাষ্ট্রনায়ক শোষিতদের মিতা,
তিনি হলেন বঙ্গবন্ধু তিনি জাতির পিতা।
খোকা: তাই নাকি মা? যোদ্ধা তিনি? করেছিলেন লড়াই?
তাঁকে নিয়ে তাই তোমাদের গৌরব আর বড়াই?
মাগো তোমার বঙ্গবন্ধু কোথায় থাকেন বলো,
সামনা সামনি দেখব তাঁকে আমায় নিয়ে চলো।
মা: বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের সকল খানেই থাকেন,
আদর করে বাংলাদেশকে বুকের মধ্যে রাখেন
জন্মেছিলেন গোপালগঞ্জে, টুঙ্গিপাড়া গ্রামে
নিত্য চিঠি লিখেন তিনি লাল সবুজের খামে।
খোকা: আমিও চিঠি লিখবো তাকে কোথায় পাব খাম?
ঠিকানাটা দাও লিখে দাও, দাও লিখে তার নাম।
মা: নাম হলো তার শেখ মুজিবুর শুনতে লাগে বেশ
শেখ মুজিবের নামের পাশে লিখবি বাংলাদেশ।
খোকা: তাতেই চিঠি পৌঁছে যাবে জাতির পিতার কাছে?
মা: পৃথিবীতে এমন নায়ক আর কি কেউ আছে?
খোকা: বাংলাদেশের নামের পাশে শেখ মুজিবের নাম
লিখে রাখলাম মাগো আমি এই লিখে রাখলাম।

বড়োদের মুখে শুনে ছোটোদের লেখা মুক্তিযুদ্ধের কথা

আমার মুক্তিযুদ্ধের গল্প

সামারা রশীদ

আমার বুদ্ধি হবার পরই মুক্তিযুদ্ধ কথাটি শুনেছি। আরো শুনেছি স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস আর শহিদ দিবসের কথা, কিন্তু তার কোনো মানে আমি বুঝতে পারতাম না। যখন আমি প্রথম শ্রেণির বাংলা বই-এ 'মুক্তিযোদ্ধাদের কথা' গল্পটি পড়ি তখন থেকেই আমি জানতে পারি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের গল্প, কীভাবে স্বাধীন হয়েছিল এদেশ। বাংলাদেশের স্বাধীনতায় আমাদের মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদানের কথা জানতে পারি। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে তিনি স্বাধীনতার ডাক দিলেন। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েই আপামর জনতা মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল। হ্যাঁ আমি সেই মুক্তিযুদ্ধের গল্প বলছি। ২৫ শে মার্চ কালরাত্রি। পাকিস্তানি সৈন্যরা অতর্কিত নিরীহ বাঙালির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং নির্বিচারে গুলি বর্ষণ করল। একের পর এক গ্রাম আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিল এবং নিরীহ মানুষ হত্যার মহা নেশায় মেতে উঠল। কিন্তু বাঙালিরাও ছাড়ার পাত্র নয়। তাদেরই মধ্যে একদল ছেলে ইন্ডিয়া যাবার পরিকল্পনা করল ট্রেনিং নেবার জন্য। তারা বৃষ্টিতে ভিজে, রোদে পুড়ে অসীম সাহস নিয়ে, মাইলের পর মাইল পাড়ি দিয়ে এগুতে লাগল। যখন তারা পৌঁছালো তখন দেখল এক বিশাল নদী পার হতে হবে যার নাম পদ্মা। নদীর ওপাড়ে গিয়ে দেখল এক পাকিস্তানি সৈন্য বসে আছে। একজন বাঙালি সৈন্য পাকিস্তানি সেনার কপালে ইট মারল এবং দৌড় দিয়ে বন্দুকটি কেড়ে নিল। এভাবে তারা বেশ কয়েকটি অস্ত্র ছিনিয়ে নিল। তাদের সাহসিকতায় পাকিস্তানি সৈন্যরা ভীত বিহ্বল হয়ে গেল। তারপর তারা পাকিস্তানি ক্যাম্প আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিল। একদিন সন্ধ্যায় পাকিস্তানি সেনারা চা-পান করছিল। হঠাৎ মুক্তিসেনারা তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এভাবে পালটা গোলাগুলিতে রাত কেটে গেল। পাকসেনাদের গুলিতে কয়েকজন মুক্তিসেনা আহত হলো। এক সময় পাকসেনারা মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে না পেড়ে হাল ছেড়ে দিল এবং আত্মসমর্পণ করল। চার পাশে বিজয়ের ধ্বনি বাজতে লাগল, আকাশে বাতাসে শুধু বিজয়ের গান। মুক্তিযোদ্ধারা বুঝতে পারল দেশ স্বাধীন হয়েছে। এটাই আমার মুক্তিযুদ্ধের গল্প।

তৃতীয় শ্রেণি, ভিকারুননিসা নূন স্কুল, ঢাকা

জুনায়েদ তৌহিদ, তৃতীয় শ্রেণি, এস এম মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ

ঈদ গল্প-৯

জিতে গেল ব্যাঙ ছানা

কামাল হোসাইন

ঝমঝম করে শুরু হলো বৃষ্টি। বৃষ্টি মানেই ব্যাঙ আর তাদের ছানাপোনাদের ভারি আনন্দ। পুকুর-ডোবা বৃষ্টির পানিতে টইটম্বুর থাকলে ওদের প্রাণ ভরে যায়। খুশিতে ডিগবাজি দিয়ে গেয়ে ওঠে বৃষ্টির গান। ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ, ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ। মা কোলাব্যাঙ ছোট্টমোট্ট ব্যাঙ, ছানাদের অফোলা গলায় গান গাইতে দেখে বিগলিত হয়ে ওঠে। উৎসাহ দেয় আরো ভালো করে গান গাইবার জন্য।

মায়ের সম্মতি পেয়ে ওরা আরো গলা ফোলায়। লাফালাফি বাড়িয়ে দেয় দ্বিগুণ।

এই ব্যাঙ মায়ের মোট ছয় ছানা। ছয়টির রং ছোটোবেলায় কাছাকাছি থাকলেও, সূক্ষ্ম কিছু রঙিন আঁচড় তাদের আলাদা করে তুলেছে। হলুদ ব্যাঙ, নীল ব্যাঙ, কমলা ব্যাঙ, কালচে ব্যাঙ, লালাভ ব্যাঙ আর ছাইরঙা-ব্যাঙ। এ সকল ব্যাঙ ছানার গায়ে মাথা থেকে পায়ের দিকে লম্বালম্বি কালচে টান। দেখতে বেশ মজার।

মা-ব্যাঙ ছানাদের পিঠে সময় সময় আদর বুলিয়ে দেয়। লেজ ধরে নেড়ে দেয়। তখন চোখ বন্ধ করে তারা মায়ের আদর খায়। চুপচাপ বসে থাকে, আরো আদর পাওয়ার জন্য। মা আদর করা শেষ করলেও চোখ মেলে না তারা। মায়ের আদরের রেশ যেন শেষ হয় না তাদের মন থেকে।

মা-ব্যাঙ তো আছেই, বাবা-ব্যাঙও তাদের আদর আর যত্নের কম করে না।

মা-ব্যাঙ ছানাদের চারপাশের পরিবেশের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। এর পাশাপাশি তাদের চারপাশ ঘিরে যারা কেবল ঘুরে বেড়ায়, গলা ছেড়ে বাবা আর মা-ব্যাঙের মতো ঘ্যাঙ ঘ্যাঙ ডাকে, তাদের সঙ্গেও আলাপ করিয়ে দেয় মা-ব্যাঙ। কেউ সম্পর্কে ছানাপোনাদের খালা-ব্যাঙ, কেউ ফুফু-ব্যাঙ, কেউ দাদা-ব্যাঙ, আবার কেউবা নানা, মামা, চাচা। পরিচয় হতে গিয়ে ছয় ব্যাঙ-ছানা ভারি খুশি হয়। খুশিতে চোখটা চিকচিক করে ওঠে ওদের। সকলের আদরমাখা আচরণে ওরা দারুণভাবে পুলকিত।

ভাবে– আহারে! তাদের আশেপাশে কত না শুভাকাঙ্ক্ষী! সবাই তাদের কত না আদর বুলিয়ে দিয়েছে। কত না ভালো ভালো কথা বলেছে। এখানে যাবে না– বিপদ হবে। অমুকের কাছে গলা সাধা শেখো, তাহলে ভালো ঘ্যাঙ-গাইয়ে হতে পারবে। এরকম অনেক উপদেশ দিয়েছে তারা।

মা আর বাবা-ব্যাঙের খুব ইচ্ছে– তাদের ছানাপোনাদের মধ্যে অন্তত কেউ একজন মস্ত গাইয়ে হোক। এই গাঁ থেকে অনেক দূর দূর গাঁয়ে গিয়ে তারা গান করুক। গোটা ব্যাঙ-সমাজের কাছে তাদের কদর বাড়ুক। যখন সবাই তাদের ছানাপোনার নাম করবে, এই সঙ্গে তো বাবা-মা হিসেবে তাদের কথাও কেউ না কেউ মনে করবে। এর চেয়ে আর খুশির খবর কী হতে পারে?

এজন্য বাবা-ব্যাঙ তাদের তিন ছানা-ব্যাঙকে পাশের গাঁয়ের ওস্তাদ-ব্যাঙের ডেরায় ভর্তি করিয়ে দেয়। সেখানে ওরা প্রতিদিন ওস্তাদ-ব্যাঙের কাছে গলা সাধে আর সারেগামা গায়। ওস্তাদ-ব্যাঙ হলুদ ছানা-ব্যাঙের গলা শুনেই বুঝে নিয়েছে, তাকে দিয়ে হবে। খুব সুন্দর গলা ওর। সে ঘ্যাঙ-গাইয়ে না হয়েই যায় না।

ওস্তাদ-ব্যাঙের মুখে হলুদ ছানা-ব্যাঙের প্রশংসা শুনে বাবা-ব্যাঙ খুব খুশি হয়। মনে মনে সে নিজেকে একজন ভাগ্যবান আর গর্বিত পিতা ভাবতে শুরু করে।

ওস্তাদ-ব্যাঙ গানের তালিম দিতে দিতে চলার পথের নানা কথাও শেখায় তাদের। ব্যাঙ-ছানারা গভীর মনোযোগের সঙ্গে তা শোনে। নিজেদের আগামীর জন্য তৈরি করে। তারাই তো বড়ো হয়ে...

ওস্তাদ-ব্যাঙ বলেছে– সামনে এগিয়ে যেতে অনেক বাধা আর প্রতিকূল পরিবেশের মুখে তাদের পড়তে হবে। সেই সব বাধা ডিঙিয়ে যেতে পারলে তবেই জীবনে সফলতা আসবে। আর যদি তারা শুরুতেই অল্পতে ভেঙে পড়ে, নুয়ে পড়ে– তবে তাদের যেমন সব শেষ হয়ে যাবে, তেমনি তাদের ব্যাঙ বাবা-মায়ের সকল আশানিরাশায় ডুবে যাবে।

ওস্তাদ-ব্যাঙের এসব কথা শুনে ব্যাঙ-ছানাদের মনে সাহস বাড়ে। তারা ভাবে– নিশ্চয়ই তারা পারবে। পারতে তাদের হবেই। ব্যাঙ বাবা-মায়ের মুখ উজ্জ্বল করতে হবে। গাঁয়ের নাম ব্যাঙ-সমাজের মুখে মুখে যাতে থাকে, সেই চেষ্টা করতে হবে। আপনমনেই তাই ব্যাঙ-ছানারা গেয়ে ওঠে–

ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ
আমরা কোলাব্যাঙ–
আমাদের যে আটকে দেবে
মারব তাদের ল্যাঙ...
আমরা কোলাব্যাঙ।

ওরা গলাগলি করে গান গাইতে গাইতে পথ চলতে শুরু করে।

ওস্তাদ-ব্যাঙের ডেরা থেকে ওদের বাড়িটা তেমন দূরে নয়। তবু ওরা তো ছোটো। ভয় তো লাগেই। আসতে-যেতে কত না বিপদ-আপদ এসে হাজির হতে পারে। এজন্য ওরা আশেপাশে দেখেশুনে পথ চলে।

এতদিন ওদের ওস্তাদের ডেরায় ওদের মা অথবা বাবা-ব্যাঙ পৌঁছে দিত। ওরা একটু বড়ো হওয়ায় এখন মা বা বাবা-ব্যাঙ আর নিয়ে যাওয়া-আসা করে না। ওরাও একটু একটু করে সাহস পেয়েছে নিজেরা চলাফেরা করার ব্যাপারে। তাই তারা তিন ছানা মিলে গলাগলি করে ওস্তাদের ডেরায় গান শিখতে যায়। আবার সময়মতো ফিরে আসে।

একদিন একটা ঢোঁড়া সাপ ওদের তাড়া করেছিল। বলা যায়, সেদিন ওরা বড়ো বাঁচা বেঁচে গিয়েছিল। ওরা তিনজন এমনভাবে একটা বড়ো পাতার নিচে লুকিয়ে গিয়েছিল, সাপটা কোনোভাবেই আর ওদের খুঁজে পায়নি।

মা-বাবা আর পড়শি ব্যাঙেরা ওদের পইপই করে ওই ঢোঁড়া সাপের ব্যাপারে সাবধান করে দিয়েছিল।

আজও ওরা তিন ব্যাঙ-ছানা ওস্তাদের ডেরা থেকে গান শিখে গলাগলি করে ফিরছিল বাড়ি। ঢোঁড়া সাপটা যেন ওদের জন্যই অপেক্ষা করছিল। সেও লুকিয়ে ছিল একটা বনের ঝোপে। ব্যাঙ-ছানারা যেই না সেই ঝোপের কাছে এল, আর অমনি সাপটা ফোঁস করে ওদের পথ আগলে দাঁড়ালো।

আচমকা ঢোঁড়া সাপকে সামনে দেখে ওরাও হকচকিয়ে গেল। ছোট্ট বুকটা ভয়ে কেঁপে ওঠে ওদের। এই বুঝি সাপের পেটে জায়গা হলো ওদের!

সাপটা যেন হিংসায় জ্বলে ওঠে। বলে, খুব তো সেদিন আমার চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে গেলি। কিন্তু আজ তোদের কে বাঁচাবে বাছাধনেরা?

ভয়ে মুখ শুকিয়ে আমশি হয়ে গেল ছানাদের। মুখে যেন কোনো কথাও জোগালো না। তবু এক ছানা অনুনয় বিনয় করল। যাতে ওদের সে ছেড়ে দেয়। কিন্তু সাপ কোনো কথা শুনতেই নারাজ।

সে তেড়ে এল। ছানারা বুঝতে পারল, এ ব্যাটা কোনো কথাই শুনবে না। তাই তারাও লুকোনোর জায়গা খুঁজতে থাকল। আস্তে-আস্তে পেছালো ওরা। দেখে সাপও এগোলো ওদের দিকে। ছানাদের পেছনে একটা বেশ বড়োসড়ো পাথর খণ্ড। সাপটা মাথা তুলল, ছোবল দেবে। যেই না ছোবল দিল, অমনি দুই ব্যাঙ-ছানা দুই দিকে ছিটকে গিয়ে পড়ল। অন্যটা সেই পাথরের নিচে আশ্রয় নিল। আর তার সুবাদে সাপের ছোবল পড়ল গিয়ে সোজা পাথরের উপর। সঙ্গে সঙ্গে সাপটা 'বাবাগো-মাগো' বলে চিৎকার জুড়ে দিল।

ছানারা ভয়ে ভয়ে ঘটনা কী বুঝতে মাথা তুলে দেখে, সাপের মুখে তখন রক্তারক্তি কাণ্ড। সাপ আর কোনো দিকে না তাকিয়ে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে-কাঁদতে পালিয়ে গেল।

আর ছানারা জান ফিরে পেয়ে খুশিতে গেয়ে উঠল–

ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ
আমরা কোলাব্যাঙ–
আমাদের যে আটকে দেবে
মারব তাদের ল্যাঙ...
আমরা কোলাব্যাঙ।

ছন্দে ছড়ায় শুদ্ধাচার

জাকির হোসেন কামাল

১
কাজের মাঝে থাকে আমার সৎ চিন্তা নিহিত,
তৈরি আছি সকল কাজের করতে জবাবদিহি তো।

২
যুদ্ধ করে দেশ পেয়েছি শুদ্ধ রাখি মাটি,
সাম্য ন্যায়ে রাখব এদেশ দারুণ পরিপাটি।

৩
কাজ করেছি নিয়ম মেনে দেখতে পারো যত,
সকল কিছুই রইল খোলা স্বচ্ছ কাচের মতো।

৪
সর্বক্ষেত্রে পরিত্যাজ্য নিন্দা এবং তোষণ,
বন্ধ হোক সমাজ থেকে অনাচার আর শোষণ।

৫
সবার সাথে মিলেমিশে সাজাই আমার দেশ,
মনটা থেকে সরাই দূরে হিংসে ও বিদ্বেষ।

৬
এসো সবাই সামলে রাখি হিংসে এবং ক্রোধ,
জাগ্রত হোক সবার মাঝে মানবতার বোধ।

৭
যে করে হোক মিল থাকা চাই কথা এবং কাজে,
পাছে যেন কেউ না বলে লোকটা ভীষণ বাজে।

৮
কাজ রাখি না ফেলে আমি যথাসময় করি,
নিষ্ঠা এবং ভালোবাসায় সোনার স্বদেশ গড়ি।

বাবা মানে কী !

হামিদা খানম

বাবা মানে,
বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে দু-চোখ মেলে তাকালে,
একটি শিশুর অস্তিত্বের ঘোষণা।

বাবা মানে,
লাফ দিয়ে কোলে ওঠা,
আঙুল ধরে গুটি পায়ে হাঁটতে শেখা।

বাবা মানে,
লাল-নীল বেলুন উড়িয়ে,
জন্মদিনের কেক কাটা।

বাবা মানে,
মেলা থেকে কিনে আনা মাটির পুতুল নিয়ে,
প্রথম পুতুল খেলা।

বাবা মানে,
স্টেডিয়ামে টুর্নামেন্ট খেলা দেখতে যাওয়া,
প্রথম ক্রিকেট ব্যাট হাতে ধরা।

বাবা মানে,
ফুটবলে প্রথম লাথি মারা,
ম্যারাডোনা, রোনালদো, মেসি আর নেইমারকে চেনা।

বাবা মানে,
মার্কেট আর শপিং মলে,
নতুন জামা ও রঙিন জুতো কেনা।

বাবা মানে
স্লেট, পেনসিল হাতে হাতেখড়ি,
'অ' তে অজগর, A তে Apple পড়তে শেখা।

বাবা মানে
পাটিগণিত, অ্যালজেব্রা ও জিওমেট্রিকের সূত্র শেখা,
গ্রামারের ডেফিনেশন মুখস্ত করা।

বাবা মানে
ডিকশনারিতে অর্থ খোঁজা,
ট্র্যান্সলেশন আর রচনা লেখার কৌশল শেখা।

বাবা মানে,
বুকের মাঝে গিটার নিয়ে গান ধরা,
হারমোনিয়ামের রীডগুলোতে সুর তোলা।

বাবা মানে,
মাথা উঁচু করে জীবনকে চিনতে শেখা,
জীবন যুদ্ধে সংগ্রাম করে বাঁচতে জানা।

বাবা মানে,
শাসনের সাথে ভালোবাসাকে নিংড়ে নেওয়া,
ভয় নিয়ে বুকের কোণে আদর পাওয়া।

বাবা মানে
বট বৃক্ষের ছায়ার তলায়,
নিরাপদ জীবন লাভ।

বাবা মানে
যাপিত জীবনের পথে,
আনন্দের ফুল ধারায় বেঁচে থাকা।

বাবার কষ্ট

ফজলে আহমেদ

বাবা চলে গেলেন।

বাবাকে কখনো মিথ্যে কথা বলতে শুনিনি। তিনি মাঝেমধ্যে তার ছেলে-মেয়েদেরকে ডেকে একত্রে জড়ো করে বলতেন, যত বড়ো বিপদই আসুক না কেন, তোমরা কেউ কখনো মিথ্যে কথা বলবে না। সদা সত্য কথা বলবে। কারণ সত্যের দীপশিখা চিরদিন জ্বলে। আর সত্যের কোনো ধ্বংস নেই। আর মিথ্যেবাদীকে কেউ কখনো বিশ্বাস করে না। তাই ওরা জীবনে উন্নতি করতে পারে না। আমি চাই না, আমার ছেলে-মেয়েরা সারাজীবনে একটি মিথ্যে কথা বলুক।

বাবা খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠতেন। নামাজ আদায় করে তজবি জপতেন। শব্দ করে একটু জোরে জোরে কয়েকটা সুরা পড়তেন। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরের ঘরে শুয়ে থাকা কৃষিকাজে নিয়োজিত কাজের লোকদের ডেকে তুলে লাঙল, জোয়াল ও গরু নিয়ে সোজা মাঠে চলে যেতেন। আনুমানিক দশটার দিকে সবাইকে নিয়ে বাড়ি ফিরে আসতেন এবং তাদেরকে নিয়ে নাস্তা খেতেন। এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটতে কোনোদিন দেখিনি আমি।

বাবা, খুবই কম কথা বলতেন এবং যা বলতেন তাই করতেন। '৭১ সালে স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু হলে, তিনি পালের সমস্ত গরু বিক্রি করে দিলেন। মা ও আমরা সমস্ত ভাইবোনেরা মিলে নিষেধ করলাম, কারো কথাই তিনি শুনলেন না। তিনি শুধু হতাশা মিশ্রিত গলায় বললেন, অপেক্ষা কোরো, আমাদেরকে অনেক কিছুই হারাতে হবে। যদিও বাঙালিরা হারানোর ভয় করে না। আমিও করি না। তবে পতঙ্গ যেমন আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাঙালিরাও ঠিক তেমনই স্বাধীনতার যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সেখানে মৃত্যুর কথাটা একদণ্ডও ভাবেনি। ভাবছে স্বাধীনতার কথা।

হঠাৎ একদিন পাক মিলিটারিরা কাওরাইদ রেলওয়ে স্টেশনে স্থায়ীভাবে ক্যাম্প স্থাপন করে বসে গেল। ওদেরকে সহযোগিতা করতে এলাকার বিপথগামী কিছু লোক রাজাকার বাহিনীতে যোগদান দিচ্ছে। ব্যাপারটা সবাইকে শঙ্কিত করে তোলে। এরাই আমাদের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করবে।

প্রথম দিকে পাক মিলিটারিরা ক্যাম্প থেকে বের হতো না। এখন ওরা বিভিন্ন স্থানে অপারেশনে বের হয়। নির্বিচারে নিরীহ সাধারণ মানুষকে গুলি করে হত্যা করে। বাড়িঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। আর সুযোগ পেলে মোরগ, মুরগি ও ছাগল ধরে নিয়ে যায়। গ্রাম এলাকায় ওদের অত্যাচার দিন দিন বেড়ে যেতে থাকে। এমন দিন নেই যে, ওরা আট-দশজন লোককে গুলি করে হত্যা না করে। কাওরাইদ রেলওয়ে স্টেশন থেকে মাখল গোদারাঘাটের দূরত্ব মাইল পাঁচেকের পথ। একমাত্র পা দুটোর ওপর নির্ভর ছাড়া এই পথে যাতায়াতের বিকল্প কোনো ব্যবস্থা নেই। পাক মিলিটারিরা এই এলাকায় অপারেশনে এলে, আমাদের গ্রামের সমস্ত লোকজন পাগলের মতো দৌড়ে নদীর ওপারে চলে যায়। ওটাই হলো সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা, কারণ পাক মিলিটারিদেরকে কোনো দিন নদী পেরিয়ে ওপারে যেতে দেখিনি।

একদিন মাকে বাবার কাছে জিজ্ঞেস করতে শুনলাম, আপনি প্রায়ই আমার কাছ থেকে টাকা নেন। নিতে নিতে গরু বিক্রির টাকাগুলো শেষ করে ফেললেন। টাকা নিয়ে কোথায় কী করেন? একটু বলবেন। তিনি বললেন, আমরা টাকা না দিলে মুক্তিযোদ্ধারা খাবে কী? ওরা টাকা পাবে কোথায়? জেনে খুব খুশি হলাম। নইলে একটা রহস্য থেকে যেত। ছেলে-মেয়েরাও মাঝে সাঝে জিজ্ঞেস করে, বাবা টাকা নিয়ে কোথায় যায়? কী করে?

সকাল থেকেই শোনা যাচ্ছে। আজ এই এলাকায় পাক মিলিটারি ও রাজাকার বাহিনীর সদস্যরা অপারেশনে আসবে। কারণ গত রাতে ওদের ক্যাম্পে নাকি গেরিলা আক্রমণ হয়েছে। তাই ওরা খুব খ্যাপা। ব্যাপক ক্ষতি করার সম্ভাবনা আছে। সকাল থেকেই লোকজন দিশেহারার মতো দৌড়াদৌড়ি, ছোটাছুটি, করে নদীর ওপারে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে। বাবার একটা গুণ ছিল। নিজের বাড়ি ও আশেপাশের লোকদেরকে বাড়ি থেকে বের করে বিদায় করে দিয়ে এক সময় সবাই চলে গেলে তারপর তিনি যেতেন। সবাইকে বিদায়ের পর তিনি রওনা দিচ্ছেন তখন হঠাৎ প্রচণ্ড রকমের গুলির শব্দ। একদম কাছে বলে মনে হচ্ছে। তাহলে পাকমিলিটারিরা কী কাছাকাছি এসে গেছে? তিনি খুব দ্রুত হাঁটতে শুরু করে দিলেন। আমাদের বাড়ির পূর্ব দিকে, খানিকটা দূরে একটা বিরাট বড়ো বাঁশঝাড় আছে। বাঁশঝাড়টি উত্তর-দক্ষিণ দিকে লম্বালম্বি। বাঁশঝাড়টির পাশ দিয়ে একটি খাল বয়ে গেছে। খালটি কখনো শুকিয়ে যায় কখনো পানি থাকে। কলকল শব্দে পানি বয়ে যায়।

বাবা বাঁশঝাড় পেরিয়ে, খাল পাড়ে পা রাখতে বাঁশঝাড়ের ভেতর থেকে দুজন রাজাকার দ্রুত বেরিয়ে আসে। একজন হল্ড শব্দ করতেই বাবা ধুম করে দাঁড়িয়ে পড়েন। একজন রাজাকার বাবার বুকে রাইফেলটি তাক করে ধরে রাখে। তিনি তখন নির্বাক চোখে ওর দিকে তাকিয়ে থাকেন। নিশ্চিত মৃত্যু আজ। কারণ ওদের রাইফেলের গুলি কাউকে ছাড়ে না। আজও ছাড়বে না। তিনি মনে মনে দোয়া-কালাম পড়তে শুরু করলেন। যাক, মৃত্যুর সময় দোয়া-কালামটা মুখে থাকুক। অন্য রাজাকারটা এগিয়ে এসে, বাবার গালে পরপর কয়েকটা থাপ্পড় মেরে, রাগে গজগজ করতে করতে বলল, বৃদ্ধ বলে বেঁচে গেলে, যা ভাগ।

বাবার গায়ে তখন হাঁটার মতো শক্তি নেই। তবু অনেক চেষ্টা করে শক্তি খাটিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে নদীর পাড়ে চলে গেলেন।

বাবা কী পরিমাণে লজ্জা পেয়েছেন, কী পরিমাণ অপমান বোধ করেছেন তা একমাত্র তাকে ছাড়া, অন্য কারো বোঝার কোনো ক্ষমতা নেই। তিনি যেন একজন মৃত মানুষের মতো হয়ে গেলেন। তার ভেতরে কোনো চেতনা নেই, অনুভূতি নেই। কোনো কিছুর তাগিদ নেই। একেবারেই ঘরমুখী হয়ে গেলেন। দিনে দিনে তিনি মৃত্যুর দিকে ধাবিত হতে থাকেন। তিনি স্বাধীন দেশটা দেখে গেলেন। মৃত্যুর আগে সবাইকে ডেকে বললেন, তোমরা সবাই রাজাকারদের আজীবন ঘৃণা করে যাবে। আর ওদের নামের পরে থু থু দেবে।

বাবার মৃত্যুটা মেনে নেওয়া যায়, কারণ মানুষ মরণশীল। কিন্তু বাবার বুকে যে কষ্ট ছিল, তা কিছুতেই আমরা মেনে নিতে পারি না। কারণ তা যেন আমাদেরও কষ্ট।

আমাদের স্থলের বৃহত্তম প্রাণী

ড. আ ন ম আমিনুর রহমান

ছোট্ট মনিরা, তোমরা নিশ্চয়ই জানো পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো প্রাণীর নাম?

'কি জানো না?'

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছ– নীল তিমি।'

পৃথিবীতে স্থল, জল ও আকাশে বিচরণরত যত প্রাণী আছে তাদের সকলের মধ্যে এই নীল তিমিই (Blue Whale) সবচেয়ে বড়ো প্রাণী। স্তন্যপায়ী প্রাণী বলো আর সরীসৃপ, উভচর প্রাণী, মাছ বা পাখিই বলো, সব ধরনের প্রাণীর মধ্যেই নীল তিমি সবচেয়ে বড়ো।

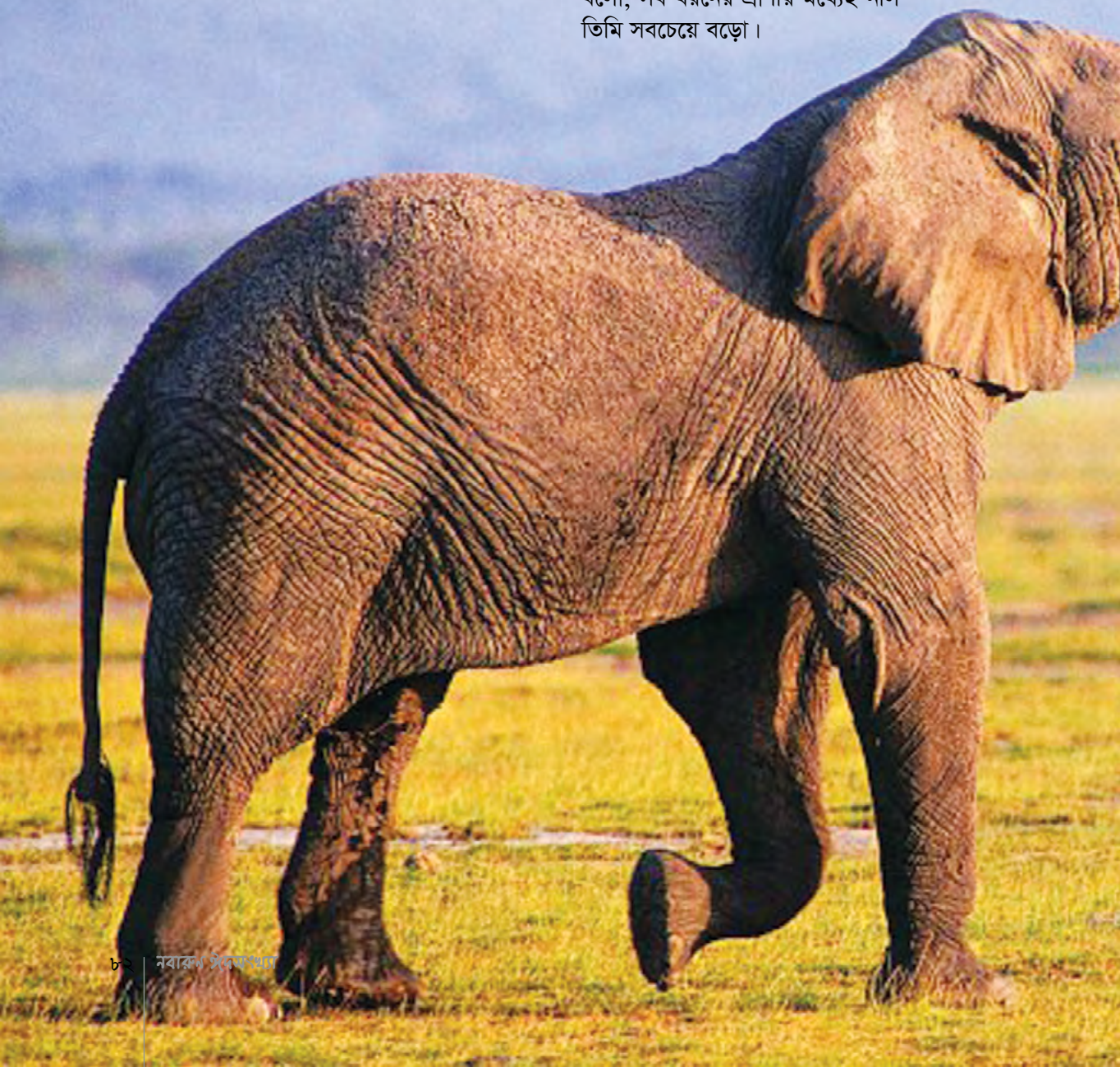

যাহোক, আজকে এ নিয়ে গল্প করব না। আজকে যাকে নিয়ে গল্প করব সে হলো আমাদের এই প্রিয় বাংলাদেশের স্থলভাগে বসবাসরত সবচেয়ে বড়ো প্রাণী।

'এবার বলতে পারবে তো কে সে?'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ, হাতি। হাতিই হলো আমাদের দেশের স্থলের সবচেয়ে বড়ো প্রাণী।'

হাতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানার আগে বুনো হাতি সম্পর্কে আমার একটি অভিজ্ঞতার গল্প বলছি। মনোযোগ দিয়ে শোনো।

২০১২ সালের ৯ই মার্চের ঘটনা এটি। সেদিন সকালে রাঙামাটি জেলার কাপ্তাইয়ে আমার ভাইপো মেজর খায়রুলের ওখানে বেড়াতে গিয়েছিলাম। ওর সাথে নানা কথা বলতে বলতে এক সময় বুনো হাতি দেখার প্রসঙ্গ এল। ও বলল কদিন আগে কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে প্রায় ৮ কিলোমিটার ভিতরে কাপ্তাইমুখ বন বিটে ও হাতি দেখেছে। তখন বিকাল চারটা বাজে।

'এখন গেলে কী দেখা যাবে?'– আমি বললাম।

সে বলল– 'এটা ভাগ্যের ব্যাপার, তবে চেষ্টা করতে দোষ কী?'

হাতির খোঁজ আছে জেনে কিছুটা উত্তেজিত হলাম। আগে কয়েকবার চেষ্টা করেও দেখা পাইনি। আর্মিদের ফোর হুইল জিপে রওয়ানা হলাম। কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের পিছন দিয়ে প্রায় ৮ কিলোমিটার পথ। সরু উঁচুনীচু রাস্তা সাপের মতো এঁকেবেঁকে চলে গেছে। এ রাস্তায় লোকজনের তেমন যাতায়াত নেই। দু'পাশের প্রাকৃতির দৃশ্যের জুড়ি নেই। পথে বানর ছাড়াও মোহনচূড়া, বড়ো পানকৌড়ি, ফটিকজল ও খয়েরি মাথা সুঁইচোরা পাখির দেখা মিলল।

আমরা কাপ্তাইমুখ বন বিটে পৌঁছালে বন বিটের ফরেস্টার ও গার্ডরা এগিয়ে এল। কিন্তু উদ্দেশ্য শুনে কিছুটা হতাশ হলো। কারণ সপ্তাহখানেক আগে এক রাতে হাতি মামারা তাদের বিট অফিস ও বাসস্থানে আক্রমণ করেছিল।

ওরা বলল 'সুন্দরবনে বাঘ যেমন মামা, এখানে হাতিও তেমনি।' তবে এ যাত্রায় দরজায় শুঁড় দিয়ে আঘাত ও একটি গাছ উপড়ে ফেলা ছাড়া তেমন কোনো ক্ষতি করেনি। হাতির ছবি তুলতে চাই শুনে ফরেস্টার সুলতান মাহমুদ বললেন– 'একটু রিস্ক নিতে হবে'। কারণ একটা দলছুট খ্যাপাটে পুরুষ হাতি আছে। ওটাকেই যত ভয়। আমার সঙ্গে আসা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক ড. জীবন রিস্ক নিতে চাচ্ছিল না। কিন্তু আমার ইচ্ছাশক্তির কাছে সে পরাস্ত হলো।

ভাইপো মেজর খায়রুল অন্যদের সঙ্গে গল্পে মশগুল হলো। আমি ও জীবন সুলতান মাহমুদের সঙ্গে সিকি কিলোমিটার দূরে হাতির সন্ধানে গেলাম। ১৮৭৮ সালের পুরনো সেগুন বাগানের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি। বেশ কিছু মোটাসোটা পুরোনো গাছ আছে। যাত্রা পথে হাতির মল ও কিছু দোমড়ানো-মোচড়ানো গাছ দেখলাম। আচমকা একটি বনমোরগ ও তিনটি বনমুরগি 'কক্ক-কক্ক-কক্ক' শব্দে দৌড়ে পালালো। দূর থেকে ধনেশ পাখির ডাক শুনলাম। বেশ সাবধানে হাঁটছি। বেশ কিছুক্ষণ লুকিয়ে থেকেও হাতির দেখা পেলাম না। দুর্ভাগ্য! অগত্যা সাহস করে হাতির বিশ্রামের জায়গায় গেলাম। নতুন-পুরনো প্রচুর মল। জায়গাটা বনের অন্যান্য স্থান থেকে তুলনামুলকভাবে বেশ ঠান্ডা, সে কারণেই হয়ত মামাদের পছন্দ। সুলতান মাহমুদের মতে কাপ্তাইমুখে ৩০–৪০টি ছোটো-বড়ো হাতি আছে। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, ফিরতে

হবে। একটি ভিমরাজ লম্বা লেজের ঝালর ঝুলিয়ে সুন্দর ভঙ্গিমায় উড়ে সেগুনের মগডালে গিয়ে বসল।

কাপ্তাইমুখ বিট ছেড়ে অর্ধেক পথ আসার পর ভাইপোর মোবাইল বেজে উঠল। সে উত্তেজিত হয়ে বলল হাতির পাল বাঁধের কাছে। দ্রুত যেতে হবে। এক জায়গায় এসে হঠাৎ-ই গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়লাম। পাহাড়ের উপর থেকে মাত্র ৫০–৬০ গজ নিচে ছরার পাশে একটা বাচ্চা হাতি। আকার অনেকটা ডুলা হাজরার সেই হাতিটির মতো, বুনো পরিবেশে যার ছবি তুলেছিলাম। তবে কাপ্তাইয়ের মামা ছবি তোলার সুযোগ না দিয়ে মুহূর্তেই জঙ্গলে উধাও হলো।

দ্রুত গাড়িতে উঠলাম। অন্ধকার হয়ে এসেছে। ছবি তোলার আশা নেই; এক নজর দেখতে পেলেই খুশি। বাঁধের কাছাকাছি এসে দেখি শ'খানেক মানুষ পাহাড়ের উপর থেকে ছরার দিকে তাকিয়ে আছে। প্রায় ২০০ গজ দূর থেকে হাতির পাল দেখলাম। বিভিন্ন বয়সের অনেকগুলো হাতি, গুণতে পারলাম না। মানুষের কোলাহলে দ্রুত ডাকতে ডাকতে হাতিগুলো জঙ্গলে হারিয়ে গেল। অন্ধকারেই দু'চারটা ক্লিক করলাম।

স্থলের সবচেয়ে বড়ো প্রাণী হাতি দু-শো বছর আগেও সারা দেশের বন জুড়ে ছিল। এখন এদের বিচরণ ক্ষেত্র ১,৮০০ বর্গ কিলোমিটারে নেমে এসেছে। বর্তমানে চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার প্রভৃতি জেলার মিশ্র চিরসবুজ বন এবং শেরপুরের মিশ্র পাতাঝরা বনে এদের বাস। এছাড়াও নেত্রকোনা, কুড়িগ্রাম, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজারে মাঝে মাঝে কিছু হাতির দেখা মেলে যেগুলো মূলত ভারত থেকে আসে। সূত্রমতে, বর্তমানে এদেশে বুনো হাতির সংখ্যা ২৫০টিরও কম। এছাড়াও প্রায় ১০০টি পোষা হাতি রয়েছে বিভিন্ন সার্কাস, চিড়িয়াখানা ও অন্যান্য ব্যক্তির কাছে। আবাস এলাকা ধ্বংস ও সংকোচন, শিকার এবং মানুষ-হাতি দ্বন্দ্ব প্রভৃতি কারণে দিনে দিনে এদের সংখ্যা কমে গিয়ে বর্তমানে এদেশে হাতি বিরল ও মহাবিপন্ন (Critically Endangered) প্রাণীতে পরিণত হয়েছে। তাছাড়া পুরো বিশ্বে বর্তমানে এরা বিপন্ন বলে বিবেচিত।

হাতি এদেশে হস্তি, গাজা বা ঐরাবত নামেও পরিচিত। ইংরেজি নাম Asian Elephant বা Indian Elephant. এলিফ্যানটিডি (Elephantidae) গোত্রের অন্তর্গত হাতির বৈজ্ঞানিক নাম *এলিফাস ম্যাক্সিমাস* (*Elephus maximus*). বাংলাদেশ ছাড়াও এই প্রজাতির হাতি ভারত, নেপাল, ভুটান, শ্রীলংকা, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, লাওস, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ায় পাওয়া যায়। আফ্রিকায় যে হাতি দেখা যায়, সেগুলো এই একই গোত্র এলিফ্যানটিডি-এর সদস্য হলেও দু'টো ভিন্ন প্রজাতির, যেমন– বড়ো আকারের আফ্রিকান বুশ এলিফ্যান্ট বা *লক্সোডন্টা আফ্রিকানা* (*Loxodonta africana*) এবং ছোটো আকারের আফ্রিকান ফরেস্ট এলিফ্যান্ট বা *লক্সোডন্টা সাইক্লোটিস* (*Loxodonta cyclotis*)।

স্থলের সবচেয়ে বড়ো ও ভারী স্তন্যপায়ী প্রাণী হাতির দেহের দৈর্ঘ্য ৫.৫–৬.৫ মিটার, লেজ ১.২–১.৫ মিটার ও উচ্চতা ২.৪–২.৭ মিটার। ওজন প্রায় তিন টন। সদ্য জন্মানো বাচ্চা ০.৯ মিটার উঁচু ও ওজন প্রায় ৯০ কেজি। স্ত্রীর তুলনায় পুরুষ আকারে বড়ো। দেহের রং ধূসর ও পুরো দেহ ঘন ঢিলেঢালা বিক্ষিপ্ত চুলে আবৃত। শুঁড় লম্বা, কান প্রশস্ত ও ত্রিকোণাকার। মাথা বেশ বড়ো, ঘাড় খাটো ও দেহ স্থূল। চোখ ছোটো হলেও তীক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন। গজদন্ত লম্বায় ১.৮ মিটার। স্তম্ভের মতো পাগুলো সোজা।

হাতি এদেশে মিশ্র পাতাঝরা বন ও আশপাশের গ্রাম, চিরসবুজ ও আধা চিরসবুজ বন, চা-বাগান, তৃণভূমি, জলা, নীচুভূমি ইত্যাদিতে বাস করে। এরা দিবাচর ও নিশাচর। সামাজিক এই প্রাণীগুলো ৫০–৬০টির দলে থাকে। এরা ঘাস, কলাগাছ, বাঁশ, গাছের বাকল ও পাতা, ফল, ফুল ইত্যাদি খায়। ফসলের ক্ষেতেও হানা দেয়। প্রতিদিন গড়ে ১৫০ কেজি খাদ্য ও ৮০-২০০ লিটার পানি পান করে। এরা পানি ও কাদা নিয়ে খেলতে বেশ পছন্দ করে।

মার্চ থেকে জুন হলো হাতির প্রজননকাল। প্রায় ২২ মাস গর্ভধারণের পর স্ত্রী হাতি একটি বাছুরের জন্ম দেয়। মেয়ে বাছুর ৯-১৫ ও ছেলে বাছুর প্রায় ১৫ বছরে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়। বুনো পরিবেশে এরা প্রায় ৬০-৭০ বছর বাঁচে। তবে আবদ্ধাবস্থায় অর্থাৎ পোষা হাতি, সার্কাস বা চিড়িয়াখানার হাতিগুলো ১০০ বছরও বাঁচতে পারে।

৫ই জুন
বিশ্ব পরিবেশ
দিবস

চলো ভালো রাখি পরিবেশ

মোকারম হোসেন

মাসখানেক আগে গিয়েছিলাম খুলনা জেলার ডুমুরিয়ায়। সেখান থেকে গেলাম পাইকগাছা উপজেলার দেলোটি ইউনিয়নে। ডুমুরিয়া থেকে দেলোটি যেতে তিনটি খেয়া পার হয়েছি। বসতি খুব বেশি নেই। বিক্ষিপ্তভাবে গোলপাতা, হাড়গজা, গেওয়া আর পাটিবেতের ঝাড় চোখে পড়ল। নদীগুলোতে নিয়মিত জোয়ারভাটা হচ্ছে। চারপাশের ভূ-প্রকৃতি দেখে অনুমান করা যায়–এক সময় এই অবধি সুন্দরবন বিস্তৃত ছিল। সেটা অবশ্য অন্য গল্প। তার আগে দেলোটি ইউনিয়নে কেন গিয়েছি সে কথা বলি। দেলোটি ইউনিয়ন পরিষদের অফিস নদীর যে পাড়ে তার বিপরীত পাড়ে ইউনিয়নের মূল বসতি। ইউনিয়নের অফিস ঘরের সামনে আছে একটি সাদা পদ্মের পুকুর। এই পদ্মপুকুরের বয়স প্রায় ৭০ বছর। কিন্তু বছর কয়েক আগে দেখা দিল বিপত্তি। জলোচ্ছ্বাসের নোনাজল এসে ঢুকল পুকুরে। মরে গেল সবগুলো পদ্ম গাছ। পরে আবার এনে লাগানো হলো পদ্ম। অল্প দিনেই ভরে গেল পুকুর। পদ্ম মিঠা পানিতে প্রাকৃতিকভাবেই জন্মে। কিন্তু নোনা পানি তার শত্রু। অবশ্য নোনাপানি যে শুধু পদ্মেরই শত্রু তা নয়, সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকেও ব্যাহত করে। আসলে সুন্দরবনসহ দেশের উপকূলবর্তী জেলাগুলোতে নোনাপানির বিস্তার ক্রমেই বাড়ছে। পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা গবেষণা করে দেখেছেন এখন জোয়ারের সময় আগের চেয়ে বেশি পরিমাণে নোনাপানি বনে ঢুকছে এবং এসব পানি আবার সহজে নেমেও যাচ্ছে না। ফলে বনের অনেক গাছ মরে যাচ্ছে। সহজ কথায় এটা হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব।

তাই জলবায়ু পরিবর্তন নামক এই অসুখ সারাতে সারা বিশ্বের নেতারা প্রতিবছর কোথাও না কোথাও মিলিত হয়ে নানা উপায় খুঁজতে থাকেন। আমাদের দেশও এসব সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। দেশে কী ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটছে তা জানানো হয়। এখন সারা বিশ্বই জানে যে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বাংলাদেশ বেশ ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। মানুষকে প্রতিনিয়তই নানান দুর্যোগ মোকাবিলা করতে হচ্ছে। অবশ্য ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে ঝড়, বন্যা, খরা ও জলোচ্ছ্বাস আমাদের নিত্য সঙ্গী। নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও কর্মদক্ষতার মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছি। তবে পরিবেশ ভালো রাখার জন্য আরো অনেক কাজ করতে হবে আমাদের। আমরা যারা পৃথিবী নামক এই গ্রহে বাস করছি তারা যদি পরিবেশ দূষণ না কমাতে পারি তাহলে পৃথিবীর ধ্বংস অনিবার্য। আর একথা আমরা সবাই জানি, উন্নত দেশগুলোই পরিবেশ দূষণের জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী। আমাদের দেশেও দূষণ লক্ষ করা যায়। আমরা নির্বিচারে বন ধ্বংস করছি, নদী দখল করছি, পাহাড় কেটে সমান করছি, প্রাকৃতিক জলাশয় ভরাট করছি, প্রাণীদের আবাসস্থল নষ্ট করছি। এসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কারখানার বর্জ্য। যা প্রকৃতিকে চরম পরিস্থিতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

এবার আরেকটি অভিজ্ঞতার কথা বলি। বছর কয়েক আগে গাজীপুরে একটি ফল বাগান দেখতে গিয়েছিলাম। বাগানের কর্তা ব্যক্তি গাছপালা ঘুরে দেখানোর এক ফাঁকে বেশ গর্বের ভঙ্গিতে বললেন এখানে দেশীয় সব ফল গাছই আছে। আমি বললাম, গাছ তো অনেক কিন্তু ফল দেখছি না কোনো গাছে। তিনি কোনো ভণিতা না করেই সরাসরি আশপাশের ইটভাটাগুলোকে দায়ী করলেন। চিমনি নির্গত ধোঁয়া থেকে সৃষ্ট দূষণের কারণে ফুলের পরাগায়ণের সুযোগ পায় না। আসলে চিমনির উচ্চতা যতটা হওয়া উচিত ঠিক ততটা না হওয়ায় এই সমস্যা। এখানে সমস্যা শুধু ফল বাগানেই নয়, ফসলের ক্ষেত্রেও।

এ পরিবেশ বদলে ফেলা যাবে না। শিল্পনগরী খুলনার কথাই ধরা যাক। সেখানকার কলকারখানার বর্জ্যগুলো শোধন ছাড়াই পরিত্যক্ত মাঠ কিংবা জলা বা খাল হয়ে নদীতে যায়। অদূরেই মংলা বন্দর। বন্দরে আসা জাহাজগুলোর বর্জ্যও ফেলে দেওয়া হয় পানিতে। মাঝে মাঝে তেলবাহী জাহাজও ডুবে যায়। ইতোমধ্যেই এসব বর্জ্য সুন্দরবনের জীব-বৈচিত্র্যের জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে উঠেছে। কিন্তু আমাদের হাতে এমন কোনো ম্যাজিক নেই যে রাতারাতি সব কিছু বদলে দেওয়া যাবে। কাজেই আগাতে হবে পরিকল্পিত উপায়ে।

শুধুমাত্র সমন্বিত উদ্যোগই এমন একটি জটিল সমস্যা থেকে উত্তরণের সহজ পথ হতে পারে। প্রথমত: গণসচেতনতা, দ্বিতীয়ত: সরকারের নজরদারি, তৃতীয়ত: আইনের কঠিন প্রয়োগ, চতুর্থত: অর্থনৈতিক ভারসাম্যতা। উল্লিখিত সকল উপাদানগুলোর একটির সঙ্গে অন্যটির সমন্বয় তৈরি হলে আমরা কেবল উন্নয়নের পথে কয়েক পা আগাতে পারি। সচেতনতা এ ক্ষেত্রে প্রধান নিয়ামক হিসেবে কাজ করবে। মানুষ সুশিক্ষিত হলেই কেবল সচেতন হতে পারে। সঙ্গে যদি সচ্ছলতা যোগ হয় তার ফলাফল নিঃসন্দেহে ভালো।

শিক্ষার্থীরা পরিবেশ ও তার প্রাসঙ্গিকতাগুলো যেন উপলব্ধি করতে পারেন সে জন্য ছাত্রজীবন থেকে মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে বড়ো হলে তার একটি সুদূরপ্রসারী ইতিবাচক প্রভাব থাকে। এটা হচ্ছে ভবিষ্যৎ সচেতন নাগরিক তৈরির প্রথম পদক্ষেপ। পরবর্তী সময়ে প্রতিটি নাগরিক যাতে স্বেচ্ছায় কিংবা নিজের তাগিদে ক্ষতিকর দিকগুলো এড়িয়ে চলতে পারেন সেদিকেও লক্ষ রাখতে হবে।

সোনালি ব্যাগ

তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

বাংলাদেশের সোনালি আঁশ হচ্ছে পাট। সেই সোনালি আঁশ থেকে তৈরি হচ্ছে সোনালি ব্যাগ। যা দেখতে একদম পলিথিনের মতো। পলিথিনই বটে তবে আমাদের আনাচে কানাচে ডোবা, নালায় পরিবেশ ধ্বংসকারী যে-সব পলিথিন পাওয়া যায় এটি সেই পলিথিন নয়। এটি হচ্ছে পরিবেশবান্ধব পলিথিন যাতে নেই কোনো প্লাস্টিক উপকরণ। ব্যাগগুলো বানানো হয়েছে কেবল পাটের আঁশ ব্যবহার করে। এই আঁশ থেকে পচনশীল পলিমার ব্যাগ তৈরির পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন বাংলাদেশের একজন বিজ্ঞানী। পাটের তৈরি এই পলিব্যাগ দেখতে বাজারের সাধারণ পলিথিন ব্যাগের মতো হলেও এটি অনেক বেশি টেকসই ও মজবুত। পাটের সুক্ষ্ম সেলুলোজ প্রক্রিয়াজাত করে তৈরি করা এ পলিব্যাগ কয়েক মাসের মধ্যেই মাটির সঙ্গে মিশে যায়। এছাড়া বর্তমানে বিদেশ থেকে আমদানি করা পচনশীল যেসব পলিথিন আমাদের বাজারে পাওয়া যায় সেগুলোর পাঁচ ভাগের এক ভাগ দামে এই সোনালি ব্যাগ পাওয়া যায়। তাই এটিকে পরিবেশের ক্ষতিকর পলিথিনের একটি নির্ভরযোগ্য বিকল্প হিসেবে ভাবা হচ্ছে।

পাটের আঁশ থেকে পলিমার তৈরির এ পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশনের (বিজেএমসি)-এর প্রধান বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা অধ্যাপক মোবারক আহমদ খান। তার দীর্ঘ ২০ বছরের সাধনার ফল এটি। এই পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্য বাংলাদেশ বিজ্ঞান একাডেমি ২০১৫ সালে তাকে স্বর্ণপদক দেন। এর আগে ২০০৯ সালে তিনিই পাটের সঙ্গে পলিমারের মিশ্রণ ঘটিয়ে টেকসই, মজবুত এবং সাশ্রয়ী দামে 'জুটিন' নামে ডেউটিন তৈরি করেন। রাজধানী ডেমরার শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে সরকারি পাটকল লতিফ বাওয়ানী জুট মিলে পরীক্ষামূলকভাবে স্বল্প পরিমাণে তৈরি হচ্ছে সোনালি ব্যাগ। আয়োজন চলছে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনের।

ডেনমার্কের কোপেনহেগেন ভিত্তিক সংস্থা 'দ্য ওয়ার্ল্ড কাউন্টস' এর মতে, সারা বিশ্বে প্রতিবছর প্রায় ৫ লাখ কোটি পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার করা হয়। এর মাত্র ১ শতাংশ পুনর্ব্যবহারের জন্য প্রক্রিয়াজাত করা হয়। সমুদ্রে ফেলা হয় ১০ শতাংশ। এসব পলিব্যাগ একশত বছরেও পচবে না বা মাটিতে মিশবে না। পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলনের এক পরিসংখ্যান মতে, শুধু ঢাকায় প্রতিদিন ১ কোটি ৪০ লাখ পলিথিন ব্যাগ জমা হয়। পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর পলিথিনের ব্যাগ বিশ্ব জুড়ে যখন উদবেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন পাটের তৈরি এই পলিব্যাগ বিশ্বের পরিবেশ দূষণ অনেকাংশে কমাবে বলে ধারণা করা হয়।

অন্যের ঈদে যাদের আনন্দ

মেজবাউল হক

ঈদ মানে আনন্দ, ঈদ মানে খুশি, ঈদ মানে একটু অবসর। কর্মব্যস্ত মানুষ ঈদের আনন্দে উচ্ছ্বাসে মেতে উঠে, সময় কাটায় পরিবার পরিজন নিয়ে নিজেদের মতো করে। কেউ কেউ বেড়াতে যায় প্রিয় কিছু স্থানে, আবার কেউ পাড়ি দেয় অন্যদেশে। অন্য আবহে দিনগুলোতে উপভোগ করবে বলে।

আবার কেউ আছেন শুধু পেশাগত দায়িত্বের কারণে পরিবার পরিজনের সাথে সময় না কাটিয়ে আমাদের সুযোগ করে দেন। কর্মস্থলে থেকে দায়িত্ব পালন করেন ঈদের দিনও। আর এ জন্য মনে একটু কষ্ট হলেও কাজগুলো তারা আনন্দেই করে থাকেন।

ঈদের সময় বন্ধ থাকে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। তবে কিছু প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বের ধরন এমন যে সেগুলোতে সারা বছর এক মুহূর্তের জন্যও কাজ বন্ধ থাকে না। ঈদের ছুটি উপেক্ষা করে পুলিশ, শহরের পরিচ্ছন্নতা কর্মী, ফায়ার সার্ভিস কর্মী, কারাগারে দায়িত্বপ্রাপ্তরা, সংবাদ মাধ্যম, হাসপাতাল, পরিবহণ কর্মী, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত নিরাপত্তাকর্মীসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়োজিত কর্মীদের ঈদের দিনেও কাজ করতে হয়।

পুলিশে নিয়োজিত কর্মজীবীগণ ঈদের দিনও থাকেন কর্মস্থলে। সাধারণ মানুষরা যাতে নির্বিঘ্নে ঈদের আনন্দ উপভোগ করতে পারে সেজন্য পুলিশবাহিনী রাত-দিন পরিশ্রম করে দায়িত্ব পালন করেন। নাড়ির টানে অনেকে বাসা কিংবা অফিসে তালা ঝুলিয়ে গ্রামের বাড়িতে চলে যান। তাদের সবকিছু নিরাপদে থাকার জন্য নগরজুড়ে নিরাপত্তা দিতে প্রহরায় থাকেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা। একই দায়িত্ব পালন করেন বাসাবাড়ি ও বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি অফিসের নিরাপত্তা কর্মীরাও। ঈদেও ছুটি নেই তাদের। মুমূর্ষু ও জরুরি রোগীদের সেবায় ঈদের দিনও হাসপাতালে দায়িত্ব পালন করেন চিকিৎসক, নার্স ও অন্যরা। তেমনি ইলেক্ট্রনিক ও অনলাইন মিডিয়ার অনেক সাংবাদিক নিজেদের ঈদ আনন্দ বাদ দিয়ে দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকেন। টিভি পর্দায় অন্যদের ঈদ আনন্দের জোগান দেন। ঈদে যেন দায়িত্ব আরো বেড়ে যায়।

মসজিদের ইমাম বা মুয়াজ্জিনরা খুব কম সময়ই ঈদের ছুটি পান। ঈদে অনেক গুরুদায়িত্ব তাদের ওপর। যেমন- ঈদের নামাজ পড়ানো, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা ইত্যাদি। ছুটি নেই ট্রেনের টিটি, ড্রাইভার, গাড়ি চালক, লঞ্চ সাড়েং-সুকানিদেরও। তারা মনের আনন্দেই আমাদের পৌঁছে দেন নির্দিষ্ট গন্তব্যে।

চালক, কন্ডাক্টর, হেলপারদের ঈদের দিনও চলে ক্লান্তিহীন পথচলা। নেই ছুটি পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের। এই সময় তাদের অন্য সময়ের থেকে বেশি দায়িত্ব পালন করতে হয়। ছুটি মেলে না চব্বিশ ঘণ্টার অনলাইন নিউজ পোর্টাল, রেডিও- টেলিভিশনে কাজ করেন যারা। ছুটে থাকেন খবরের পিছনে, আমাদের আনন্দ দিতে গিয়ে ঈদের সময় দায়িত্ব পালন করতে হয়। সাংবাদিকদের পাশাপাশি কলাকুশলীদেরও দায়িত্বের মধ্যে থাকতে হয়। এদের সবাইকে নবারুণের পক্ষ থেকে ঈদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা।

ঈদের খাবার-দাবার

শাহানা আফরোজ

ঈদ মানেই উৎসব। সবাই মিলে আনন্দ করারই মাঝে আছে ঈদের মহত্ব। ধনী-গরিব, ছোট-বড়ো-বৃদ্ধ সকলেই একসাথে মেতে উঠে ঈদ আনন্দে। তবে ছোট্ট বন্ধুদের মাঝে ঈদ আনন্দের মাত্রাটা একটু বেশি থাকে। এটা সবসময়ই ছিল। নতুন জামা, জুতো, ঈদের দিন ঘুরে বেরানো, আত্মীয়-স্বজনদের সাথে দেখা হওয়া সবকিছুতেই যেন নতুন নতুন খুশি। তা সে যে কালেই হোকনা কেন। সময়ের বিবর্তনে এগুলো কখনোই হারিয়ে যায় না। শুধু পরিবর্তন হয়। আমার বাবার ঈদ আনন্দ ছিল একরকম। আমার ছিল আবার অন্যরকম, আর আজ ছোট্টদের ঈদটা একদমই আলাদা। যদিও হারিয়ে গেছে অনেক কিছু। হারায়নি আনন্দ-খুশি। যে যার মতো করে ভাগ করে নেয়। তবে বন্ধুরা এখানে একটু খেয়াল রাখতে হবে যেন আমরা আমাদের আত্মীয়-স্বজনকে ভুলে না যাই। প্রতিবেশীও যেন হয় আমার হাসির সঙ্গি।

ছোট্ট বন্ধুরা ঈদে অনেক অনেক আনন্দ করো তোমরা। সারাদিন ঘুড়ে বেড়াও। খাওয়া-দাওয়া কর তাই না। খাবার ঈদে একটি বড়ো জায়গা দখল করে আছে। ঈদের দিনে খাবার হয় একটু আলাদা। এইদিন সবার বাসায়ই কমবেশি মজার মজার রান্না হয়। কিছু কিছু খাবার আছে যেগুলো সব বাসায়ই ঈদের দিনে রান্না হয় এগুলোকে আমরা বলতে পারি ঈদের কমন খাবার। যেমন পোলাও, খিচুরি, জর্দা, সেমাই, মাংসের কয়েকটা পদ। এখনতো আম্মুরা চেষ্টা করে নতুন রেসিপি দিয়ে নতুন কিছু রান্না করে তোমাদের সামনে হাজির করতে। কারো কারো বাসায় থাকে পুডিং, ফিরনি, কোফতা, চটপটি, ফুচকা, আরো কত কি। আবার কারো বাসায় কিন্তু চায়নিজ আইটেমও রান্না হয় আমি জানি। কি বন্ধুরা জেনে গেলে খাওয়াতে হয়। দাওয়াত দিবে নাকি আমাদের। আম্মুরা ঈদের আগের দিন থেকে এসব রান্নার আয়োজন করে। এসবই তোমাদের জন্য। আয়োজনের-এ ধারাটা কিন্তু যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। ইতিহাসের পাতা বলে প্রায় দুতিন দিন আগে থেকেই ঈদের প্রস্তুতি শুরু হতো। কারণ তখনতো বাজারে সব কিনতে পাওয়া যেতো না। হাতে বানানো হতো সেমাই, দুধ জ্বাল দিয়ে ঘন করা হতো, ঢেকিতে চাল গুড়ো করা হতো, নতুন করে মুড়ি চিড়া করা হতো। সবকিছুই ছিল একটু সময়ের ব্যাপার। তখন প্রতিবাড়িতে হাতে বানানো গুড়ের সেমাই, চালের গুড়ো দিয়ে মলিদা, রুটি, মাংস, জরদা, ফিরনি, কখনো কখনো পিঠাও তৈরি হতো। তোমাদের মতো তখনকার যুগে সবাই সবার বাসায় যেতো, একসাথে খাওয়া দাওয়া করত।

বন্ধুরা এখন তোমাদের যুগে মায়েরাতো রান্না করেই সেই সাথে বাড়তি যোগ হয়েছে ভালো ভালো রেস্টুরেন্ট। তোমার ইচ্ছা করলেই পরিবার বন্ধুদের নিয়ে খাবার খেতে পারো ফুচকা লাচ্ছি, পিৎজা, বারগারসহ আরো কত কি। তবে বন্ধুরা ঈদের দিনে এগুলো না খাওয়াই ভালো। মায়ের রান্না সবার সাথে শেয়ার করার যে আনন্দ সেটা সবসময়ই পাওয়া যায় না। আত্মীয়স্বজনের সাথে দেখা করা। তাদের খাওয়া তাদের ভালো-মন্দের খবর নেয়ার মাঝেই ঈদের আনন্দ। এরপর বন্ধুবান্ধব রেস্টুরেন্ট তো আছেই তখন আড্ডা আর গল্পের মাঝে থাকবে না কোনো বিধিনিষেধ।

বন্ধুরা দেশে দেশে কিন্তু ঈদ খাবারে ভিন্নতা আছে। যেমন ইরাকে ঈদের দিনে গোলাপজল ও খেজুর মিশ্রিত পেস্ট্রি নাম ক্লাইফা নামে বিশেষ খাবার তৈরি হয়। সিরিয়া ও লেবাননে খেজুর ও আখরোটের কুকি, ফিলিস্তিনে বাদাম আর পাইন নাটের দিয়ে তৈরি হয় বাটার কুকি, ইন্দোনেশিয়ায় বিশেষ কেক, তুরস্ক, পেস্তা, গোলাপজল, চিনি দিয়ে তৈরি হয় লোকুম নামের খাবার আর মিসরে নারকেল দিয়ে মাংস।

ঈদ আসে আবার চলে যায়। থেকে যায় রেশ। সবার সাথে ঈদ আনন্দ ভাগ করে নাও। মজার মজার খাবার খাও। দিন শেষে মাকে ধন্যবাদ দিতে ভুলে যেওনা কিন্তু। কারণ তোমার মা সবার জন্য নিজের আনন্দ ত্যাগ করে রান্না করে। কারণ আর মজার সব খাবার খাওয়ায়।

ঈদে থাকো সুস্থ

মো. জামাল উদ্দিন

ঈদ মানে আনন্দ। ঈদ মানে খুশি। ঈদ মানে মনোরম খাবারের আয়োজন। একমাস রোজা থাকার পর হঠাৎ করে যখন আমরা আবার পূর্বের খাবারে ফিরে যাই, তখন বদহজম, বুক জ্বালাপোড়া নানা ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে। আমরা যদি একটু সতর্ক থাকি তাহলে এ ধরনের সমস্যা থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পারি। দিনে আমরা বেশি বেশি পানি খাবার খাব, তেলযুক্ত খাবার কম খাব, ঝাল এড়িয়ে যাব। তাহলে তা হবে আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী।

ঈদের দিন আমাদের বাসায় অনেক অতিথি আসে। তাদের কারণে আমরা বেশি বেশি খেয়ে ফেলি, ফলে আমাদের বদহজম ও বিভিন্ন রকম সমস্যা দেখা দেয়। আমরা যদি একসাথে বেশি না খেয়ে প্রতি ৩/৪ ঘণ্টা পর পর খাই তাহলে আমাদের হজম প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয় এবং শরীর সুস্থ থাকে।

পবিত্র রমজান মাসে আমাদের দেহ ধীরে ধীরে সারাদিনে কিছু নির্দিষ্ট সময়ে খাবার গ্রহণে অভ্যস্ত হয়ে যায়। আবার অনেকের ক্ষেত্রে শুরুর দিকে ব্যাপারটা অস্বাভাবিক ও বেশ কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে সেটা স্বাভাবিক ও উপভোগ্য হয়ে উঠে। রোজা শেষে ধীরে ধীরে আবার খাদ্যাভাস শুরু করতেও একটু সময় লাগে।

তাই রোজা পরবর্তী সময়ে কীভাবে নিজের দৈনন্দিন রুটিনে ফিরে সুস্থ ও নিরোগ থাকবে তার কিছু পরামর্শ হলো – ফজরের নামাজের আগে সামান্য কিছু খেয়ে নাও। কিছু খেজুর বা এই ধরনের কোনো খাবার হলেও চলবে। ইফতার খাবার অভ্যাস চট করে না ছাড়াই ভালো। মাগরিব নামাজের পর হালকা কোনো পানীয় খেতে পারো। চিনি ছাড়া ফলের জুস বা নন ফ্যাট দুধ দিয়ে আটার রুটি ও সবজি ভাজি বা ডিম ও ব্রাউন ব্রেড, কলা বা অন্য কোনো ফল। একসাথে বেশি পরিমাণ না খেয়ে অল্প পরিমাণ খাবার কয়েক বারে খাবার চেষ্টা করতে হবে।

বন্ধুরা, তোমাদের সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করছি। সবাইকে ঈদ মোবারক।

প্রতিবন্ধী শিশুর ঈদ আনন্দ

জান্নাতে রোজী

নবারুণের বন্ধুরা তোমরা তো প্রতিদিন স্কুলে যাও, সেখানে তোমাদের অনেক বন্ধু আছে; আবার পাড়া-পড়শিদের মধ্যেও অনেক বন্ধু আছে, যাদের সঙ্গে তোমরা খেলা কর, গল্প কর। আচ্ছা বন্ধুরা, তোমাদের ঐসব বন্ধুর মধ্যে কি কোনো প্রতিবন্ধী বা অটিস্টিক বন্ধু আছে? নিশ্চয়ই আছে কারণ আমাদের দেশে ১৫ লক্ষ ১০ হাজার ৮০০ প্রতিবন্ধীর ডাটাবেজ কিন্তু ইতোমধ্যে তৈরি হয়ে গেছে এবং শণাক্তকরণ কার্যক্রম এখনো চলছে। এরা তো আমাদেরই ভাই-বোন, বন্ধু, আত্মীয়-পরিজন।

ওদেরকে নিয়ে কিন্তু কখনো উপহাস, ঠাট্টা-বিদ্রূপ করো না। আমাদের মধ্যে কিছু মানুষ আছে, যারা ওদের সঙ্গে খাবার আচরণ করে। ঐসব মানুষগুলোর মন খুব ছোটো আর হীন বলে এমন করে। আমার নবারুণের বন্ধুদের মন তো অনেক অনেক বড়ো, এরা কখনোই প্রতিবন্ধীদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করতেই পারে না। বল বন্ধুরা, আমি ঠিক বলেছি কি না? আর জানোতো, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এসব প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুরা উপযুক্ত পরিবেশ ও আন্তরিক সহযোগিতা পেলে অনেক বড়ো কিছুও করে ফেলতে পারে। এসব শিশুদের কোনো না কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে তীক্ষ্ম মেধা থাকে। পড়ালেখা থেকে শুরু করে ছবি আঁকা, খেলাধুলা, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে এরা অবিশ্বাস্য মেধার পরিচয় দেয়। কখনো তারা সুস্থদের চেয়েও ভালো করে। তোমরা বিশ্ববিখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিংসকে জানো, তিনি কিন্তু একজন প্রতিবন্ধী ছিলেন। তোমরা আলবার্ট আইনস্টাইন, ডারউইন, নিউটনের নাম শুনেছ, ওনারাও কিন্তু জীবনের কিছুটা সময় অটিজমের মধ্য দিয়ে কাটিয়েছেন। তাহলে বল, আমরা যদি তাদের সঙ্গে বন্ধুর মতো আচরণ করি, তাদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের পরিবেশ তৈরি করে দিই তাহলে কে বলতে পারে তাদের মধ্য থেকে বের হয়ে আসবে না আজকের আইনস্টাইন অথবা হকিংস? এই

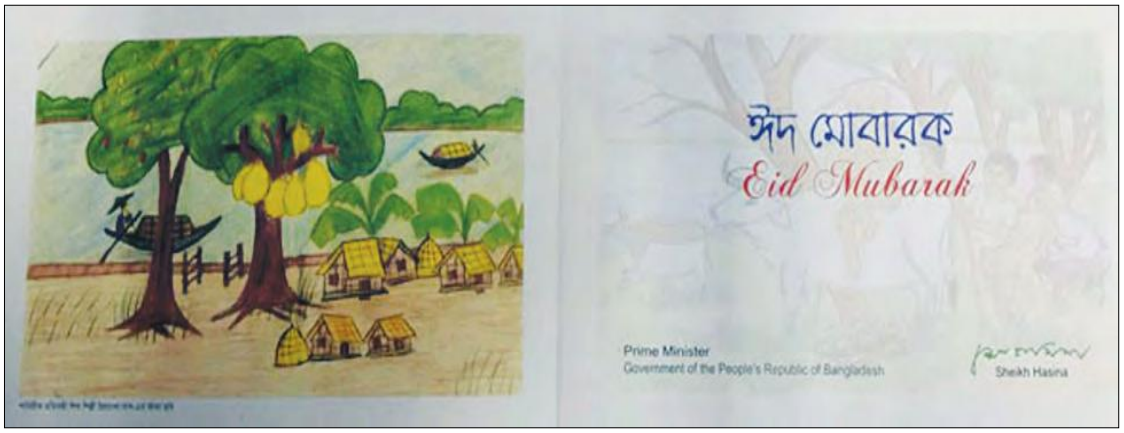

সত্যটি মনে প্রাণে উপলব্ধি করেই আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গভীর মমতায় পাশে দাঁড়িয়েছেন প্রতিবন্ধীদের। তাদেরকে সমাজে অন্য সাধারণ শিশুদের মতো প্রতিষ্ঠিত করতে উৎসাহ জোগাচ্ছেন বিভিন্ন আঙ্গিক থেকে। তোমরা তো আগেই জানো, প্রধানমন্ত্রী তাঁর ঈদের শুভেচ্ছা কার্ডে এক শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশুর আঁকা ছবি ব্যবহার করেছেন। এটা কিসের জন্য? শুধু তাদের ভালোবেসে, তাদের উজ্জীবিত করার জন্য, তাদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য। এর মাধ্যমে তিনি শুধু এদেশের প্রতিবন্ধী ও তাদের পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহমর্মিতা জানাননি; উদাহরণ তৈরি করেছেন সারাবিশ্বের জন্য। ২০১০ সালের ঈদুল আজহা থেকে তিনি প্রথম প্রতিবন্ধী শিশুদের চিত্রকর্ম দিয়ে তৈরি শুভেচ্ছা কার্ড পাঠানো শুরু করেন। এরপর থেকে তিনি ঈদ, বাংলা নববর্ষ এবং খ্রিষ্টবর্ষসহ বিভিন্ন উপলক্ষে শুভেচ্ছা কার্ড তৈরিতে প্রতিবন্ধী শিশুদের চিত্রকর্ম ব্যবহার করে আসছেন। এটা যে প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতি তাঁর অসীম স্নেহ ও ভালোবাসার প্রকাশ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর একটি প্রতিবন্ধী শিশুর জন্য এটা যে কত আনন্দের তা নিশ্চয়ই বুঝতেই পারছ তোমরা।

প্রতিবছর ঈদে আলাদাভাবে প্রতিবন্ধী শিশুদের সঙ্গে আমাদের প্রধানমন্ত্রী শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। প্রতিবন্ধী দিবসে তাদের সঙ্গে একত্রিত হন। তাদের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড উপভোগ করেন। ফলে প্রতিবন্ধী এসব বাচ্চাদের মধ্যেও বিপুল আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে-প্রতিযোগিতার মনোভাব তৈরি হয়েছে, কীভাবে আরো ভালো করা যায়।

অটিস্টিক জনগোষ্ঠীকে বিশ্বের মূলধারার অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকান্ডের সঙ্গে যুক্ত করার লক্ষ্যে তাদেরকে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করতে প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে বর্তমান সরকার। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে সেন্টার ফর নিউরোডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড অটিজম ইন চিলড্রেন সেন্টার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এডুকেশন অ্যান্ড কাউন্সেলিং সাইকোলজি বিভাগ এবং অটিস্টিকদের জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট চালু করা হয়েছে। কমিউনিটি স্বাস্থ্যকর্মী, শিক্ষক, প্রশিক্ষক, চিকিৎসক, সেবাদানকারীগণের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতিটি জেলায় প্রতিবন্ধীদের বিনামূল্যে চিকিৎসাসহ ফিজিওথেরাপির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সরকারিভাবে ভ্রাম্যমান ফিজিওথেরাপিরও ব্যবস্থা আছে। শুধু তাই নয়, মা-বাবার জন্য সেমিনারসহ বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী কন্যা সায়মা ওয়াজেদ পুতুলের অবদান অনস্বীকার্য।

এতক্ষণ তোমাদের যে কাহিনি শোনালাম তার সারসংক্ষেপ হচ্ছে এবারের ঈদে আমাদের শপথ হোক ওদের নিয়ে আমরা কেউ উপহাস, ঠাট্টা-বিদ্রূপ করব না, কেউ করলে এর প্রতিবাদ করব। ভালোবাসা দিয়ে, ওদের বন্ধু হয়ে ওদের প্রতিভা বিকাশে সহায়তা করব।

ঘুরে এসো ঈদের ছুটিতে

সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

'ও মোর রমজানের ঐ রোজার শেষে এল খুশির ঈদ'

ঈদ মানেই আনন্দ, ঈদ মানেই খুশি। প্রতিদিনের কর্মব্যস্ততার জীবনে হাঁপিয়ে উঠলে আমরা সবাই চাই একটু নির্মল আনন্দ; একটু প্রশান্তি, তাই না বন্ধুরা। একটু ছুটি পেলে কোলাহল থেকে দূরে হারিয়ে যেতে মন চায়। আর ঘুরতে যাওয়ার সবচেয়ে ভালো সময় হলো ঈদের ছুটি। ঈদের ছুটিতে তোমরা ঘুরে আসতে পারো ঢাকা অথবা ঢাকার বাইরের বিভিন্ন স্থানে। বন্ধুরা, তোমাদের জন্য কিছু দর্শনীয় স্থান ও বিনোদন কেন্দ্রের তথ্য দিলাম। ভালো লাগলে ঘুরে আসতে পারো।

আহসান মঞ্জিল: পুরোনো ঢাকার ইসলামপুরে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে আহসান মঞ্জিল অবস্থিত। এটি ছিল ঢাকার নবাবদের প্রাসাদ। এই প্রাসাদের চারপাশে সবুজ ঘাসে ছাওয়া মাঠ। ফুলের বাগান। ইচ্ছে হলে নৌকায় ঘুরতে পারো বুড়িগঙ্গা নদীতেও।

চিড়িয়াখানা: মিরপুরে জাতীয় চিড়িয়াখানার ভেতরে দেখা মিলবে নানা ধরনের পশুপাখির। ঈদে তাদের সাথে কুশল বিনিময় হলে মন্দ হয় না।

লালবাগ কেল্লা: মুঘল আমলে স্থাপিত এই দুর্গটি দেশের অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটনস্থল। এটি পুরনো ঢাকার লালবাগে অবস্থিত।

শিশু পার্ক: রাজধানীর শাহবাগে শিশুপার্কের ভেতরে শিশুদের হরেকরকম বিনোদন ও খেলার আয়োজন আছে। নামে শিশুপার্ক হলেও মা-বাবকে সাথে নিয়েই যেতে হবে এ পার্কে।

জাতীয় জাদুঘর, শাহবাগ: রাজধানীর শাহবাগে জাতীয় জাদুঘর। সেখানে রয়েছে বিশাল ডায়নোসরের কঙ্কাল, মূর্তিমান বাঘ, হরিণ, ময়ূরসহ আরো অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। যা তোমাদের হতবাক তো করবেই-সাথে আছে জানার মতো অনেক কিছু।

ফ্যান্টাসি কিংডম: বর্তমানে ঢাকাবাসীদের কাছে বিনোদন কেন্দ্রগুলোর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হলো আশুলিয়ার ফ্যান্টাসি কিংডম। সারাদিন হই-হুল্লোড়, খেলাধুলা আর খাওয়া-দাওয়ার জন্য চমৎকার বিনোদন কেন্দ্র।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্ক: গাজীপুরে সাফারি পার্কের মজাটাই ভিন্নরকম দেখা যায়। আমরা বন্দি আর পশুপাখি ঘুড়ে বেড়াচ্ছে স্বাধীনভাবে। কি মজা তাই না? গাড়িতে বসে পশুপাখিদের সাথে সাক্ষাৎ করার আনন্দই অন্যরকম।

নরসিংদীর ড্রিম হলিডে পার্ক: ঘুরে আসতে পারো নরসিংদীর ড্রিম হলিডে পার্ক। ঈদকে ঘিরে ড্রিম হলিডে পার্কটিকে সাজানো হয় বর্ণিল সাজে। এখানে রয়েছে বিনোদনের নানা আয়োজন।

ঢাকার বাইরে যেতে চাইলে ঘুরে আসতে পারো।

কক্সবাজার: বাংলাদেশের বৃহত্তম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার। বিশাল বিশাল ঢেউ, অসীম সমুদ্র, নীল আকাশ তোমাকে হাতছানি দিবে সব সময়।

ফয়েজ লেক, চট্টগ্রাম: চট্টগ্রামের পাহাড়ের পাদদেশে লেকসমৃদ্ধ বিশ্বমানের একটি ইকো-ট্যুরিজম কেন্দ্র। রয়েছে লেকের ওপর ঝুলন্ত সেতু, অত্যাধুনিক রাইডস, মোটেল রিসোর্টস, ক্লাব হাউস, নৌকা, প্যাডেল বোটসহ বিনোদনের আরো অনেক কিছু। যাবে নাকি সেখানে?

মহেশখালী: দেশের একমাত্র পাহাড়ি দ্বীপ মহেশখালী। যারা প্রকৃতির সৌন্দর্যের সন্ধানে আছো তারা ঈদে ঘুরে আসতে পারো মহেশখালী থেকেও।

ডাইনোসর পার্ক, কুমিল্লা: কুমিল্লার কোটবাড়ির ডাইনোসর পার্কে বেড়াতে গেলে স্বাগত জানাবে একদল ডাইনোসর। একদম ভয় পাবে না কিন্তু। কারণ এগুলো কৃত্রিম ডাইনোসর। এখানে আসলে তোমাদের মনে হবে যেন জুরাসিক পার্কে চলে এসেছ।

সুনামগঞ্জের দর্শনীয় স্থান: ঈদের ছুটিতে সুনামগঞ্জে কিছু দর্শনীয় স্থানেও ঘুরে আসতে পারো। যেমন- হাসন রাজার জাদুঘর, বাকের টিলা, টাঙ্গুয়ার হাওড়, যাদুকাটা নদী, শিমুল বাগান, নীলাদ্রি লেক প্রভৃতি।

আমাদের দেশে তোমাদের জন্য বিনোদনের স্থান প্রচুর রয়েছে। তবে দীর্ঘ এক মাস রোজা রাখার পর বেড়াতে যাওয়ার আগে অবশ্যই নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো গুছিয়ে নিতে ভুলো না।

রাশিয়া বিশ্বকাপ ফুটবল-২০১৮

মিজানুর রহমান মিখুন

ক্রীড়া প্রেমীদের দুয়ারে কড়া নাড়ছে 'বিশ্বকাপ ফুটবল-২০১৮'-এর জমকালো আসর। এবারের বিশ্বকাপের আসর বসবে রাশিয়াতে। এখন জেনে নেওয়া যাক বিশ্বকাপ ফুটবলের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

প্রতি চার বছর পরপর বসে বিশ্বকাপ ফুটবলের আসর। বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় এই ক্রীড়া আসর প্রথমবারের মতো রাশিয়ার মাটিতে শুরু হবে ১৪ই জুন, ফাইনাল ১৫ই জুলাই। এক মাসব্যাপী চলবে এই খেলা।

১৯৩০ সালে শুরু হওয়া বিশ্বকাপ ফুটবলের এটি হবে ২১তম আসর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে দুটি বিশ্বকাপ (১৯৪২ ও ১৯৪৬) অনুষ্ঠিত হতে পারেনি।

বিশ্বকাপের মূল পর্বে জায়গা করে নেয়ার জন্য বাছাই পর্বেও যে লড়াই শুরু হয়েছিল ২০১৫ সালের ১২ মার্চ, সেটি শেষ হলো এবার পেরুর জয়ের মাধ্যমে। এর মধ্যেই নির্ধারিত হয়ে গেছে ৩২ দল। রাশিয়া অবশ্য বিশ্বকাপের টিকিট পেয়ে গিয়েছিল অনেক আগেই- ২০১০ সালের ১০ ডিসেম্বর! সেদিনই ২০১৮ আসরের স্বাগতিক হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে রাশিয়ার নাম ঘোষণা করেছিল ফিফা। এখন শুধু স্বাগতিক দেশই পায় সরাসরি খেলার সুযোগ; এমনকি ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদেরকেও খেলতে হয় বাছাইপর্ব। ফলে রাশিয়াকে বাদ রেখে চূড়ান্ত পর্বের টিকিট ছিল আসলে ৩১টি। সেখানে প্রথমটি 'কেটে নেয়' ব্রাজিল এবং সবার শেষে ৩২ নম্বরটি পেয়েছে পেরু!

বাছাই পর্বের গণ্ডি পেরিয়ে সবার আগে রাশিয়া বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছিল ব্রাজিল। চলতি বছরের ২৮ মার্চ প্যারাগুয়েকে হারিয়ে উত্তর আমেরিকা অঞ্চলের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে ব্রাজিল নিজেদের অবস্থান এতটাই মজবুত করে যে, চার ম্যাচ হাতে রেখেই সেলেকাওরা বিশ্বকাপের টিকিট পেয়ে যায়। পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলই একমাত্র দল, যাদের রয়েছে বিশ্বকাপের ২০ আসরের প্রত্যেকটিতেই খেলার অনন্য রেকর্ড!

দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৮টি বিশ্বকাপ খেলেছে জার্মানি যার মধ্যে ১৬টি একটানা! রাজনৈতিক কারণে ১৯৫০ বিশ্বকাপ থেকে বহিস্কৃত জার্মানি ১৯৩০ সালে প্রথম আসরেও খেলেনি। এবার বাদ পড়া ইতালিও বিশ্বকাপ খেলেছে ১৮ বার, যার মধ্যে টানা খেলেছে ১৪ বার। দলটি ১৯৩০ আসরে খেলেনি এবং ১৯৫৮ সালে বাছাই পর্ব উৎরাতে পারেনি।

এবার সবার শেষে বিশ্বকাপ খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে পেরু। আন্তঃমহাদেশীয় প্লেলে-অফে নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে তাদের দেশে গিয়ে গোলশূন্য ড্র করলেও ফিরতি পর্বে ২-০ গোলে জিতে ১৯৮২ সালের পর প্রথম এবং সব মিলিয়ে পঞ্চমবার বিশ্বকাপ খেলতে যাচ্ছে উত্তর আমেরিকার দেশটি।

রাশিয়া বিশ্বকাপে খেলার স্বপ্নপূরণ হয়েছে আইসল্যান্ড ও পানামার। ফুটবল মহাযজ্ঞে এবারই প্রথম খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে দল দুটো। অবিশ্বাস্য শোনালেও সত্যি যে, ইউরোপের দেশ আইসল্যান্ডের জনসংখ্যা মাত্র ৩ লাখ ৩৫ হাজার! জনসংখ্যার হিসাবে বিশ্বকাপের সবচেয়ে ছোটো দল আইসল্যান্ড। এর আগে এই রেকর্ড ছিল ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগোর। ২০০৬ বিশ্বকাপে খেলার সময় দেশটির লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ১৩ লাখ।

ওদিকে কনকাকাফ অঞ্চল থেকে উঠে আসা মধ্য আমেরিকার দেশ পানামার আয়াতন প্রায় ৭৫ হাজার বর্গ কিলোমিটার এবং জনসংখ্যা প্রায় ৪০ লাখ। ১৯৭৮ সাল থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব খেলে শেষ ম্যাচে কোস্টারিকাকে হারিয়ে এবারই তারা চূড়ান্ত পর্বের টিকিট পেয়েছে।

ব্রাজিলে অনুষ্ঠিত গত ২০১৪ বিশ্বকাপ খেলেছে অথচ এবার বাছাইপর্ব উৎরাতে পারে নি, এমন দল ১১টি। ইউরোপ থেকে- ইতালি, নেদারল্যান্ড, গ্রিস ও বসনিয়া হার্জেগোভিনা। আফ্রিকা থেকে- আলজেরিয়া, ক্যামেরুন, ঘানা ও আইভরিকোস্ট। দক্ষিণ আমেরিকা থেকে- চিলি ও ইকুয়েডর। এবং কনকাকাফ থেকে- যুক্তরাষ্ট্র ও হন্ডুরাস।

এ পর্যন্ত ২০টি বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ৮ দল। এর মধ্যে রাশিয়া বিশ্বকাপে থাকছে না শুধু ৪ বারের শিরোপাধারী ইতালি (১৯৩৪, ১৯৩৮, ১৯৮২, ২০০৬)। অন্য ৭ বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়নই খেলবে আগামী আসরে। দলগুলো হলো- সর্বোচ্চ ৫ বার

চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল (১৯৫৮, ১৯৬২, ১০৭০, ১৯৯৪, ২০০২); ৪ বার চ্যাম্পিয়ন জার্মানি (১৯৫৪, ১৯৭৪, ১৯৯০, ২০১৪); ২ বার চ্যাম্পিয়ন উরুগুয়ে (১৯৩০ ও ১৯৫০) ও আর্জেন্টিনা (১৯৭৮ ও ১৯৮৬) এবং একবার করে ট্রফি জয়ী ইংল্যান্ড (১৯৬৬), ফ্রান্স (১৯৯৮) ও স্পেন (২০১০)।

ইতালি ছাড়া আরো ২টি দলকে রাশিয়া বিশ্বকাপ তীব্রভাবে মিস করবে- নেদারল্যান্ড ও চিলি! বিশ্বকাপের 'দুর্ভাগা দল' ডাচরা তিনবারের রানার্সআপ (১৯৭৪, ১৯৭৮, ২০১০) এবং গতবার হয়েছিল তৃতীয়। কোপা আমেরিকার শেষ দু'বারের চ্যাম্পিয়ন চিলি গত বিশ্বকাপের দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছিল।

ইতালি সর্বশেষ বিশ্বকাপ জিতেছিল ২০০৬ সালে। সেবার 'ই' গ্রুপে তাদের সঙ্গী ছিল ঘানা, চেক প্রজাতন্ত্র ও যুক্তরাষ্ট্র। মজার ব্যাপার হলো, শুধু ইতালি নয়, ওই আসরে তাদের গ্রুপসঙ্গী কোনো দলই এবার বাছাই পর্ব উৎরাতে পারেনি! এর মধ্যে চেকপ্রজাতন্ত্র যদিও পরের দুটো বিশ্বকাপ খেলেনি; কিন্তু ঘানা ও যুক্তরাষ্ট্র উভয় আসরেই ছিল!

ফিফার নিয়মানুযায়ী ইউরোপ থেকে বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ পায় সর্বোচ্চ ১৩টি দল। রাশিয়া স্বাগতিক হিসেবে সরাসরি খেলায় এবার দল হয়েছে ১৪টি। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৫টি দল খেলে আফ্রিকা থেকে।

উত্তর আমেরিকা থেকে ৪ দল সরাসরি খেলার সুযোগ পায়। পঞ্চম দল পায় প্লে-অফে খেলার সুযোগ এবং এবার সেটাই কাজে লাগিয়েছে পেরু।

এশিয়া থেকেও একই হিসেব, চার দল সরাসরি এবং পঞ্চম দল প্লে-অফ খেলে কনকাকাফ অঞ্চলের চতুর্থ দলের সঙ্গে। সেই সুবাদে উৎরে গেছে অস্ট্রেলিয়া। উত্তর ও মধ্য আমেরিকা এবং ক্যারিবীয় তথা কনকাকাফ অঞ্চল থেকে তিন দল সরাসরি খেলার যোগ্যতা পায়, চতুর্থ দল খেলে প্লে-অফ।

ওশেনিয়া অঞ্চলের জন্য সরাসরি কোনো টিকেট নেই। সেখানকার চ্যাম্পিয়ন দলকে প্লে-অফ খেলতে হয় উত্তর আমেরিকার পঞ্চম দলের সঙ্গে। এই সমীকরণে নিউজিল্যান্ড শেষ মুহূর্তে বাদ পড়ে গেছে পেরুর কাছে হেরে।

এবার তাহলে এক নজরে দেখে নিন, কোন অঞ্চল থেকে কোন দেশগুলো ২০১৮ রাশিয়া বিশ্বকাপ খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে-

রাশিয়া (স্বাগতিক), বেলজিয়াম, ইংল্যান্ড, জার্মানি, আইসল্যান্ড, পোল্যান্ড, সার্বিয়া, স্পেন, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, ক্রোয়েশিয়া, সুইডেন, পর্তুগাল, ডেনমার্ক, মিসর, নাইজেরিয়া, সেনেগাল, মরক্কো, তিউনেসিয়া, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে, কলম্বিয়া, পেরু, ইরান, জাপান, সৌদি আরব, দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, কোস্টারিকা, মেক্সিকো ও পানামা।

এবার দেখে নেওয়া যাক যে ১২টি স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপের আসর বসবে-

লুজনিকি স্টেডিয়াম : এটি ১৯৫৬ সালে ফুটবল খেলার জন্য খুলে দেওয়া হয়। স্টেডিয়ামটিতে ৮০ হাজার দর্শক বসতে পারে। এটি রাশিয়ার রাজধানী মস্কোতে অবস্থিত। ৭টি ম্যাচ এই স্টেডিয়ামটিতে অনুষ্ঠিত হবে। সেই ফাইনাল খেলার আসরও এ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে।

সেন্ট পিটার্সবার্গ স্টেডিয়াম : ৭টি ম্যাচ এই স্টেডিয়ামটিতে অনুষ্ঠিত হবে। এটি রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গ শহরে অবস্থিত। ৬৭ হাজার দর্শক ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন এই স্টেডিয়ামটি ২০১৭ সালে খেলার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। সেন্ট পিটার্সবার্গ স্টেডিয়ামে সেমি ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হবে।

ফার্স্ট অলিম্পিক স্টেডিয়াম : রাশিয়ার সোচিতে অবস্থিত ৪৮ হাজার দর্শক

ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন এ স্টেডিয়ামটি ২০১৩ সালে খুলে দেওয়া হয়। কোয়াটার ফাইনালসহ এখানে ৬টি খেলা অনুষ্ঠিত হবে।

একাটেরিনবার্গ এরেনা : এটি রাশিয়ার একাটেরিনবার্গে অবস্থিত। এটি এখনও নির্মাণাধীন হলেও ২০১৭ সালে খেলার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। স্টেডিয়ামটিতে ৪৫ হাজার দর্শক একসঙ্গে বসে খেলা দেখতে পারে।

কাজান এরেনা : এই স্টেডিয়ামটি রাশিয়ার কাজানে অবস্থিত। ৪৫ হাজার দর্শক একসঙ্গে খেলা দেখতে পারে এ স্টেডিয়ামটিতে। ২০১৩ সালে এটি ফুটবল খেলার জন্য খুলে দেওয়া হয়। কোয়াটার ফাইনালসহ এখানে ৬টি খেলা অনুষ্ঠিত হবে।

নিজনি নভোগ্রাদ স্টেডিয়াম : এই ৪৫ হাজার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন এই স্টেডিয়ামটি। ২০১৭ সালে খেলার জন্য খুলে দেওয়া হয়। কোয়াটার ফাইনালসহ এখানে ৬টি খেলা অনুষ্ঠিত হবে।

রোস্তভ এরিনা : রাশিয়ার রোস্তভ-অন-ডনে অবস্থিত। নির্মানাধীন এই স্টেডিয়ামটিতে ৪৫ হাজার দর্শক একসঙ্গে বসে খেলা দেখতে পারে। ২০১৭ সালে এটি উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। এবারের বিশ্বকাপের ৫টি আসর এই স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে।

সামারা এরেনা : ৪৫ হাজার আসনের এ স্টেডিয়ামটি রাশিয়ার সামারাতে অবস্থিত। ২০১৭ সালে এটি খেলার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। কোয়াটার ফাইনালসহ এখানে ৬টি খেলা অনুষ্ঠিত হবে।

মর্দোভিয়া এরেনা : এটির অবস্থান রাশিয়ার সারানাস্কে। এখানে ৪টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে।

ভলগোগ্রাদ এরেনা : এটি রাশিয়ার ভলগোগ্রার্ডে অবস্থিত। ৪৫ হাজার আসন বিশিষ্ট এই স্টেডিয়ামটিতে ৪টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে।

স্পার্টাক স্টেডিয়াম : রাশিয়ার রাজধানী মস্কোতে এটি অবস্থিত। ৪২ হাজার দর্শক এই স্টেডিয়ামে বসে খেলা দেখাতে পারে। ২০১৪ সালে এটি খেলার জন্য খুলে দেওয়া হয়। এ স্টেডিয়ামে ৫টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে।

কালিনিনগ্রাদ স্টেডিয়াম : এ স্টেডিয়ামে ৩৫ হাজার ২১২ জন দর্শক খেলা দেখতে পারে। নির্মাণাধীন এই স্টেডিয়ামটি ২০১৭ সালে খুলে দেওয়া হয়। এটিতে বিশ্বকাপের ৪টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে।

তাসনিয়া আফ্‌ফান মুনতাহা, ষষ্ঠ শ্রেণি, রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ

মুমতাইনা রাহমান, ১ম শ্রেণি, বিপিএটিসি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, সাভার, ঢাকা

সাহী আদভী ইসলাম, নবম শ্রেণি, ভারনন বারফোর্ড স্কুল, কানাডা

তমা বিশ্বাস, ৫ম শ্রেণি, শাহ মুল্লুকদী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ভাঙ্গা, ফরিদপুর

তৌসিফ আলম তুহিন, দশম শ্রেণি, মর্ডাণ হাই স্কুল, কুমিল্লা